দিলীপ গায়েন

ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ

ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

দিলীপ গায়েন

প্রকাশক

পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ

রেজিস্ট্রেশন নং : S/IL/63127

কেন্দ্রীয় কার্যালয়

আচার্য প্রফুল্ল নগর

থানা ও ডাকঘর : সোনারপুর, মহাকুমা ঃ বারুইপুর

জেলা : দক্ষিণ চব্বিশপরগনা

কলকাতা : ৭০০১৫০

BRAHAMONDER SANRAKSHAN
Written by Dilip Gayen
Ph. : 9831298861

প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০১৭ (এক হাজার কপি)
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০২১ (দু'হাজার কপি)

প্রকাশক : পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘ
আচার্য প্রফুল্ল নগর
থানা ও ডাকঘর : সোনারপুর, মহাকুমা : বারুইপুর
জেলা : দক্ষিণ চব্বিশপরগনা
কলকাতা : ৭০০১৫০

মুদ্রক ঃ বিভূতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩১/১এ নবীনচাঁদ বড়াল লেন
কলিকাতা-১২
ফোন ঃ ৯৮৮৩১৩৯৬২৩, ২২১৯ ৬৮৩৮
aroy2713@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান ঃ **ধানসিঁড়ি ভবন**, রূপনগর, সোনারপুর
দক্ষিণ ২৪পরগনা, কলকাতা-৭০০১৫০, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন ঃ ৯৮৩১২৯৮৮৬১ / ৯৬৭৪০৩৭০৩৬
৭৬০৫৮৪৫৬৫৪
(২) **প্রকাশকের ঠিকানায়**
(৩) **নির্ভীক পাবলিকেশন কোং**
৯ মণীন্দ্র মিত্র রো, শিয়ালদহ-৭০০০০৯

সহযোগিতা ঃ ১০০ টাকা

ভূমিকা

চোরের মায়ের বড় গলা

ভারতীয় সংবিধানে গৃহীত তফসিলিদের (SC-ST-OBC) সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে নানা ধরনের অভিযোগ বা কটূক্তি করা হয় রাস্তা-ঘাটে, ট্রেনে-বাসে, চায়ের দোকানে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, সরকারি অফিসে, এমন কি বিধানসভা বা লোকসভাতেও। 'আনন্দবাজার', 'বর্তমান', 'এই সময়', 'সংবাদ প্রতিদিন', 'দেশ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাতেও তফসিলি সংরক্ষণ সম্পর্কে নঞর্থক ও নিন্দাবাচক কথাবার্তা লেখা হয়। মূলত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সহ স্বঘোষিত উঁচুজাত গোষ্ঠীর লোকেরাই অভিযোগ করে চলেছেন। তাঁদের বক্তব্য—তফসিলি সংরক্ষণের কোটায় কম নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা ও চাকরিতে সুযোগ পাচ্ছে, সে তুলনায় বেশি নম্বর পেয়েও সাধারণ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা সুযোগ পাচ্ছে না। এর ফলে, সরকারি কর্মস্থলে অযোগ্য, অদক্ষ ও কম মেধাসম্পন্ন লোকের বৃদ্ধি ঘটছে। এতে রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষতিই হচ্ছে।

তফসিলিদের সম্পর্কে কিছু কটাক্ষ বাচক শব্দ-ভাষাও লোকমুখে বা লিখিত আকারে প্রচারিত হয়—'এসসি (SC)' অর্থ বলা হয়—সোনার চাঁদ বা সোনার চামচ, 'এসটি (ST)' অর্থ সোনার টুকরো বা সোনার টিয়া। বলা হয়—আম্বেদকরের সন্তান, কোটার মাল, সরকারের পোষ্যপুত্র, অভয়ারণ্যের জীব, ইত্যাদি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সরকার ভোটের জন্য এসসি-এসটিদের তোষণ করছে বলেও অভিযোগ করা হয়। এ ছাড়া অভিযোগ করা হয়, জাতভিত্তিক তফসিলি সংরক্ষণের জন্য সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথাও লুপ্ত হচ্ছে না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সমাজের লোকদের পক্ষ থেকে এ ধরনের অভিযোগ শুনে রীতিমতন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন তফসিলি বর্গের (SC-ST-OBC) লোকেরাও। বিশেষ করে ওবিসি (OBC) এবং মার্কসবাদী দলের তফসিলিরা অনেকেই তফসিলি সংরক্ষণের বিরোধিতা করে থাকেন। তফসিলি সংরক্ষণ প্রাপ্ত গোষ্ঠীগুলোকে হিন্দুসমাজে নিচুজাত (Lower Caste) বলেও মনে করা হয়। এর ফলে, বহুলোক পদবী পাল্টে আত্মপরিচয় গোপন করেও চলেন। তাঁরা

আম্বেদকরপন্থী আন্দোলনে সামিল হন না, যদিও সংরক্ষণের সুযোগসুবিধা চেটেপুটে খেতেও লজ্জাবোধ করেন না।

তফসিলি সংরক্ষণভুক্ত (SC-ST-OBC) মানুষদের এহেন একটা হীনমন্যতা বোধ বা ভুল বোঝাবুঝি দূর করার উদ্দেশেই আমার এ গ্রন্থ রচনার প্রয়াস। তফসিলিবর্গ তথা আমার স্বজাত-গোষ্ঠীর উদ্দেশে আমার সুস্পষ্ট বক্তব্য— ভারতে তফসিলি সংরক্ষণ ব্যবস্থার শুরু ব্রিটিশ আমলে ১৯৩০/৩১/৩২ সালে গোল টেবিল বৈঠকের পর। ১৯৩৫/৩৭ সালে সর্বপ্রথম তফসিলি জাতি (SC) দের সংরক্ষণ দেওয়া হয় রাজনীতিতে। ১৯৫০ সালের সংবিধানে তফসিলি উপজাতি (ST) সংরক্ষণ গৃহীত হয়। ১৯৯০ সালে মণ্ডল কমিশনের প্রস্তাব মেনে ওবিসি সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকরিতে ১৯৭৬/৭৭ সাল নাগাদ এসসি-এসটিদের সংরক্ষণ কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঘটনা হল, সরকার পরিচালন ব্যবস্থায় যেহেতু ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সমাজ রয়েছে এবং বিপরীতে তফসিলিরাও ঘুমিয়ে রয়েছে, সেহেতু সংরক্ষণের কোটা কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের চাকরিতে কোথাও যথাযথ পূরণ করা হয় না। সেটা ১৯৯০ সালে প্রকাশিত মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট দেখলেই ধরা পড়ে যাবে। রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে ১০০টি চাকরির পদে ৮৭ জন ব্রাহ্মণ্যসমাজের লোক এবং মাত্র ১৩টি তফসিলিবর্গের লোক।

আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হল তফসিলি সংরক্ষণের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের অভিযোগ নিছক 'চোরের মায়ের বড় গলা'। কারণ, ভারতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়--বৈশ্য প্রভৃতি উঁচুজাত গোষ্ঠীগুলো সংরক্ষণ নিয়েছে বৈদিকযুগে, আজ তিন হাজার বছর আগে। তারা বর্ণাশ্রম আইন তৈরি করে নিজেদের জন্য শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি সবকিছুই সংরক্ষিত (Reserved) করেছিল। আজও সেই বর্ণাশ্রমজাত সুযোগসুবিধা তারা ভোগও করছে। বিপরীতে বর্তমান চিহ্নিত তফসিলিদের (SC-ST-OBC) পূর্বপুরুষদের অসংরক্ষিত (De-reserved) তথা অস্পৃশ্য করে দেওয়া হয়েছিল ওই বৈদিকযুগেই (দ্রঃ গীতা, ১৮ অধ্যায়, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ)। বর্তমান তফসিলি সংরক্ষণ আইন তাই তারই ক্ষতিপূরণ (compensation) স্বরূপ গ্রহণ করা হয়েছে বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে।

সুতরাং ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণের বয়স তিন হাজার বছর এবং তফসিলিদের সংরক্ষণের বয়স মাত্র ৭০/৮০ বছর, এখনো একশ বছর হয়নি, হাজার বছর

দূরের কথা। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকরিতে তফসিলি সংরক্ষণের বয়স আরো কম, মাত্র চল্লিশ বছর। এরই মধ্যে প্রকৃত সংরক্ষণভোগী ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী গেল গেল রব তুলেছে। তারা নিজেদের সংরক্ষণের ইতিহাসকে মুছে দিতে চায়, অস্বীকার করতে চায়।

বর্ণাশ্রম আইনকে ভিত্তি করে ব্রাহ্মণরা কতধরনের সংরক্ষণ ভোগ করেছে এবং এখনো করে চলেছে, বর্তমান গ্রন্থে বিভিন্ন তথ্য সহ তা উপস্থাপন করা হয়েছে। তফসিলি বর্গের ছাত্র-ছাত্রী, চাকরিজীবী এবং সাধারণ মানুষেরা এ সব জানতে ও বুঝতে পারলে তাঁদেরকে আর হীনমন্যতায় ভুগতে হবে না, পদবী পাল্টাতে হবে না, আত্মপরিচয় গোপন করতেও হবে না। তাঁরা বরং ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সোচ্চারে প্রতিবাদ করতে পারবেন।

—দিলীপ গায়েন

সাম্যের প্রতীক ব্রাহ্মণ নয়, সে হচ্ছে ভেদের মূর্তি। এই ভারতের স্রষ্টা শূদ্র (SC-ST-OBC), এর আদিম অধিবাসী শূদ্র, এর সভ্যতা শূদ্র সভ্যতা। ব্রাহ্মণের দিন ফুরিয়ে এসেছে, বামুনের আগেও ভারতে শূদ্র ছিল এবং শূদ্রই পরে থাকবে। বামুনকে কাঁধ থেকে নামাতে না পারলে এ জাত কোনোদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। মনুর স্বত্ব (হিন্দুশাস্ত্র মনুসংহিতা) লোপ না পেলে এ দেশে মনুষ্যত্বের বিকাশ হওয়া অসম্ভব।

—শিবরাম চক্রবর্তী / মস্কো থেকে পণ্ডিচেরি

ব্রাহ্মণ্যধর্মে (হিন্দুধর্মে) আমার ঘৃণা ধরে গেছে। ব্রাহ্মণেরা আমাদের দেশে মানুষকে ছোট-বড় জাতে এমনভাবে ভাগ করে দিয়েছে যে, কেউই নিজের চেয়ে নীচু জাতের লোকের সঙ্গে মিশতে প্রস্তুত নয়।

—রাহুল সাংকৃত্যায়ন/ভোলগা থেকে গঙ্গা

ব্রাহ্মণদের হাত থেকে ভারতের সাংস্কৃতিক জগতকে মুক্ত করতে না পারলে এদেশে যুক্তিবাদী মননশীল পরিবেশ সৃষ্টি হবে না। ব্রাহ্মণরা দেবদেবীর স্রষ্টা। দেবদেবীর মূর্তিকে সাক্ষী-গোপাল হিসাবে দাঁড় করিয়ে কৌশলে চলছে ব্রাহ্মণশ্রেণির ধর্মীয় লুণ্ঠন ও সামাজিক শোষণ।

—বাবাসাহেব আম্বেদকর

বৌদ্ধধর্ম যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পরমত সহিষ্ণুতা এবং শ্রেণিভেদ না থাকায় এই ধর্মে মানুষ অতি সহজে মানুষের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছে।

—বাবাসাহেব আম্বেদকর

ঃসূচীপত্রঃ

প্রথম অধ্যায়

সামাজিক সাম্যের অন্যতম হাতিয়ার তফসিলি সংরক্ষণ

ব্রাহ্মণ সহ উঁচুজাতদের মধ্যে অনেক লোক আছে যারা দাবি করে, সমাজে তফসিলি সংরক্ষণ থাকবার জন্য জাতিভেদ প্রথা দূর হচ্ছে না।

এই সব উঁচুজাতদের কাছে পাল্টা প্রশ্ন, যখন তফসিলি সংরক্ষণ ছিল না তখন কি জাতিভেদ প্রথা ছিল না? ভারতে তফসিলি সংরক্ষণ আইন হয়েছে ১৯৩০/৩৫ সালে। যদি এই সংরক্ষণ বৈষম্য সৃষ্টি করে থাকে তাহলে বলতে হবে এর আগে সমাজে সাম্য ছিল এবং হিন্দু সমাজে জাতিভেদও ছিল না।

কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস কী? হিন্দু সমাজের চরিত্রই বা কেমন ছিল?

দেখা যাচ্ছে, তফসিলি সংরক্ষণের বহু আগে থেকেই হিন্দু সমাজে প্রচণ্ড জাতবৈষম্য ছিল। শূদ্রের ছায়াও পর্যন্ত মাড়াত না ব্রাহ্মণরা। অথচ আজ দেখা যাচ্ছে সংরক্ষণ প্রাপ্ত শূদ্রের (SC-ST-OBC) সাথে একই অফিসে একই টেবিলে চাকরি করছে ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা। এমনকি নিমন্ত্রণ খাওয়া, বিয়ে, ভ্রমণ, রাজনীতি সবেতেই ব্রাহ্মণ-শূদ্র পাশাপাশি চলছে। এর একমাত্র কারণ, তফসিলি সংরক্ষণ এবং সংবিধানে গণতান্ত্রিক ভোটব্যবস্থা গ্রহণ করা। এর ফলে অস্পৃশ্যরা শিক্ষা, চাকরি, রাজনীতি সর্বত্রই প্রবেশাধিকার পেয়েছে। ব্রাহ্মণদের তৈরি বর্ণব্যবস্থা, দেব-দেবী-মন্ত্র-যাগযজ্ঞ এবং হাজারো রীতিনীতি এ ধরনের সাম্যাব্যবস্থা তৈরির চেষ্টাই করেনি। বরং বিচ্ছেদ ঘটানোর জন্যই এই ধর্মব্যবস্থা ও জাতব্যবস্থা সৃষ্টি করেছিল ব্রাহ্মণরা।

তফসিলি সংরক্ষণ সম্পর্কে ওবিসিদের ধারণা

ওবিসি (OBC) কথার অর্থ আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশেশ (Other Backward Classes) বা অন্যান্য পশ্চাৎপদ জাতিসমূহ। বৃহত্তর অর্থে এরাও তফসিলি সংরক্ষণের আওতাভুক্ত হয়েছে ১৯৯০ সালে গৃহীত মণ্ডল কমিশনের প্রস্তাব থেকে। ভারতীয় সংবিধানের ৩৪০ অনুচ্ছেদ মোতাবেক ওবিসি চিহ্নিত করণের উদ্দেশে ১৯৫৩ সালে কার্লেলকর কমিশন ও ১৯৯০ সালে মণ্ডল কমিশন নিয়োজিত হয়েছিল। কারা ওবিসি? ১৯৩০/৩১/৩২ সালের দিকে যখন তফসিলি জাতির (SC/ST) তালিকা তৈরি হচ্ছিল তখন বহু পশ্চাৎপদ জাতি ব্রাহ্মণ্যবাদী কংগ্রেস, বিশেষ করে গান্ধির ষড়যন্ত্রে পড়ে তফসিলি জাতির তালিকা থেকে বেরিয়ে যায়। অথবা, ব্রাহ্মণ্যবাদী আমলা-কর্মচারিরা বহু পশ্চাৎপদ জাতিকে তফসিলিভুক্ত করেনি। তাদেরকেই মূলত মণ্ডল কমিশনে ওবিসি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরাও এসসি-এসটিদের ন্যায় কম-বেশি পশ্চাৎপদ জাতি এবং অতীতে এরাও ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণব্যবস্থার শিকার। অথচ উঁচুজাত হওয়ার লোভে তারা ১৯৩০/৩২ সালে তফসিলিভুক্ত হয়নি।

এহেন ওবিসিগোষ্ঠী আজ ধীরে ধীরে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। তবে ওবিসি গোষ্ঠীর কিছু গোঁয়ার-গণ্ডমূর্খ লোক আজও ওবিসি সংরক্ষণের বিরোধিতা করে নিজেদের 'হায়ার কাস্ট' রূপে ভাবছে। তারা এসসি-এসটিদের সম্পর্কেও খারাপ কথা বলে বেড়াচ্ছে। এরা ব্রাহ্মণদের চামচা বা সমর্থক। অথচ, ব্রাহ্মণরা এদেরকে নিচুজাত রূপেই দেখে।

আসল কথা, এসসি-এসটি-ওবিসি—সব গোষ্ঠীতেই কিছু আকাটমূর্খ আছে যারা ভারতের আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের চরিত্রই বোঝে না। তারা ইতিহাস জানে না, বর্তমানও বোঝে না, ভবিষ্যৎ দূরের কথা। ধূর্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী শ্রেণি এই আকাট মূর্খদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে চলেছে।

দুঃখের বিষয়, তফসিলিবর্গের (SC-ST-OBC) সহজ-সরল-নির্বোধ লোকেরা ব্রাহ্মণজাতির এই চালাকি বুঝতে অক্ষম। বিশেষ করে সংরক্ষণের কোটায় চাকরিপ্রাপ্ত অধিকাংশ তফসিলি ব্যক্তি, মার্কসবাদী দলের সমর্থক এবং ওবিসিবর্গের অধিকাংশ লোক অত্যন্ত নির্বোধ ও সরল। তাঁরা কোনো মতেই ব্রাহ্মণজাতির ষড়যন্ত্র বুঝতে পারছেন না। বুঝবার চেষ্টাও করছেন না। শুধু এড়ো

তর্ক করে নিজেদের কবর নিজেরাই খুঁড়ছেন। আত্মহননকারী এই লোকেরা অর্থনীতি ভিত্তিক সংরক্ষণ দাবি করে থাকেন।

অর্থনীতির ভিত্তিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করার আগে ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল ধরে চালু ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্য প্রথা ও পদবী প্রথা ধ্বংস করতে হবে। দ্বিতীয়ত, এই মুহূর্তে তফসিলিবর্গের সংরক্ষণের বাইরে দরিদ্রতার ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ সহ সাধারণদের অন্তত ১০ শতাংশ সংরক্ষণ চালু করা যেতে পারে। এটা যদি সফলতার মুখ দেখে, যদি প্রকৃত গরীব ব্রাহ্মণরা সুযোগ পায়, তাহলে ভবিষ্যতে সব সংরক্ষণ দরিদ্রতার ভিত্তিতে করা যেতে পারে। তবে অবশ্যই তার আগে ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্য ও সকলের পদবী প্রথার বিলুপ্ত করতে হবে। রাজনীতি ও সরকার পরিচালনায় তফসিলিদের উপযুক্ত সংখ্যা থাকতে হবে। তা না হলে যুগ যুগ ধরে এগিয়ে থাকা ব্রাহ্মণ্যসমাজ দমিয়ে রাখবে তফসিলিদের। ব্রাহ্মণরা যদি এ ধরনের প্রস্তাবে রাজি না হয় তাহলে বুঝতে হবে ব্রাহ্মণরা নিজেদের স্বার্থেই অর্থনীতি ভিত্তিক সংরক্ষণ চাইছে, প্রকৃত গরীবদের জন্য নয়।

ব্রাহ্মণরা কি ব্রহ্মজ্ঞানী

ভারতে আর্য-আক্রমণের আগে (১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পর্যন্ত 'ব্রাহ্মণ' বা 'ব্রহ্ম' শব্দ ছিল না। আর্যদের ধূর্ত ও বুদ্ধিমান অংশ সর্বপ্রথম প্রচার করেছে পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা 'ব্রহ্ম' নামক এক নিরাকার শক্তি। পৃথিবীকে তারা ব্রহ্মাণ্ড বা ব্রহ্মের অণ্ড (সন্তান, ডিম) বলে অভিহিত করেছে। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ করেছে 'বৃহৎ'। ব্রাহ্মণরা নিজেদের এই বৃহৎ শক্তির মুখ থেকে জন্ম সন্তান বলে প্রচার করেছে (দ্রঃ ঋকবেদ, ১০ম মণ্ডল, পুরুষসূক্ত, ১২নং শ্লোক)। ব্রাহ্মণরা নিজেদের বৃহৎজ্ঞানী, ব্রহ্মজ্ঞানী, সদ্‌বংশ, উচ্চবংশ, পবিত্রবংশ ইত্যাদি বলে দাবি করেছে। বৈদিকযুগে তারা আর্য-দেবতা সেজেছে। তাদের এসব দাবির মূলে ছিল সাধারণ মানুষের উপর মাতব্বরি ফলানো এবং বিনা পরিশ্রমে অন্যের উৎপাদিত শস্য আত্মসাৎ করা। প্রশ্ন হল, ব্রাহ্মণ নামক এই জাতি কি ব্রহ্মজ্ঞানী বা বৃহৎ জ্ঞানের অধিকারী? তারা কি কোনো যুগেই ব্রহ্মজ্ঞানী ছিল?

বৈদিকযুগে 'ব্রাহ্মণ' শব্দের উৎপত্তি থেকে এ পর্যন্ত ব্রাহ্মণজাতির চরিত্র বিশ্লেষণ করে বলা যায়, তাঁরা পুঁথিগত বিদ্যায় অনেকটা এগিয়ে গেছে বটে, যুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্কতা প্রভৃতি বিষয়ে ঠিক ততটাই পিছিয়ে রয়েছে। ব্রাহ্মণজাতির চারটি স্বভাব—জাত্যভিমান, মিথ্যাচারী, অত্যাচারী ও ষড়যন্ত্রকারী। ব্রাহ্মণবংশে জন্ম মানুষেরা আজও নিজেদের উঁচুজাত, উঁচুবংশ, শ্রেষ্ঠবংশ ইত্যাদি বলে দাবি করে থাকে। অন্যদের তারা নিচুজাত বলেই মনে করে। মার্কসবাদী দলের ব্রাহ্মণদের মধ্যেও এই জাত্যভিমান লক্ষ করা যায়। বিজ্ঞানমঞ্চের ব্রাহ্মণরা, চিকিৎসক-অধ্যাপক-উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণরাও একই দোষে দুষ্ট। এ ছাড়া, কবি-সাহিত্যিক স্তরের ব্রাহ্মণরাও জাত্যভিমান থেকে মুক্ত নয়। ঈশ্বরের অবতার বলে খ্যাত রামকৃষ্ণ, অনুকূলচন্দ্র কেউই জাত্যভিমানের উর্ধ্বে নন।

ব্রাহ্মণদের দ্বিতীয়স্বভাব, মিথ্যাচারিতা। ভারতে আর্য আগমনের আগে সিন্ধু-হরপ্পার সময় ছিল প্রকৃতি তথা সনাতন ধর্ম। বস্তু বা প্রকৃতিকেই চূড়ান্ত সত্য ও শক্তিমান বলে মনে করা হত সনাতন ধর্মে। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জল, বায়ু, গাছ, মাটি, পাহাড়, নদী, মানুষ, জীব-জন্তু প্রভৃতির উর্ধ্বে কোনো অলৌকিক নিরাকার শক্তি আছে—এ বিশ্বাস ছিল না সনাতন ধর্মে। কিন্তু বহিরাগত আর্যরা এসব প্রাকৃতিক শক্তির উর্ধ্বে কোনো এক চূড়ান্ত শক্তি (ব্রহ্ম) আছে বলে সর্ব প্রথম প্রচার করে। আর্য-ব্রাহ্মণদের এই প্রচার যে সর্বৈব মিথ্যে তা বর্তমান বিজ্ঞানও স্বীকার করে। তবুও হিন্দু ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য ধর্মের মৌলবাদী গুরুরা আজও স্বর্গ-ঈশ্বর-আল্লা-গড্-দেব-দেবী-পুজো-যজ্ঞ-নমাজ-প্রার্থনা-মন্ত্র- পুনর্জন্ম প্রভৃতি মিথ্যাচারে বিশ্বাসী। ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত উচ্চশিক্ষিত লোকেরাও এসব তত্ত্বে বিশ্বাসী। হিন্দু ধর্মে দেব-দেবী-অবতার বাবাজী-স্বামীজী এবং নানারকমের প্রথা সৃষ্টি করে জনগণের টাকা ও জিনিসপত্র আত্মসাৎ করছে ব্রাহ্মণরা।

ব্রাহ্মণদের তৃতীয় ও চতুর্থ স্বভাব অত্যাচার ও ষড়যন্ত্র করা। বর্ণাশ্রম আইন তৈরি করে উঁচু-নিচু ভেদ প্রথা সৃষ্টি করেছে তারা। নিচুবর্ণীয়দের শিক্ষা ও অন্যান্য অধিকার কেড়ে নিয়েছে। সাম্যবাদী সনাতন তথা বৌদ্ধ ধর্মকে ধ্বংস করেছে ব্রাহ্মণরা। বৌদ্ধ বা শূদ্রদের কানে গরম তেল দেওয়া, জিহ্বা কেটে নেওয়া, রামকর্তৃক শম্বুকের মস্তক ছেদন (রামায়ণ), দ্রোণাচার্য কর্তৃক একলব্যের অঙ্গুলিকর্তন (মহাভারত) প্রভৃতি দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মণ ও তাদের সহযোগী ক্ষত্রিয়দের অত্যাচারের নমুনা।

ব্রাহ্মণরা আজও বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ, ঈশ্বরতত্ত্ব, পুজো-আচ্চা, তফসিলিদের

(SC-ST-OBC) প্রতি বঞ্চনা, নির্যাতন প্রভৃতি চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় কখনোই সঙ্ঘবদ্ধভাবে কুসংস্কারগ্রস্ত হিন্দু ধর্মের উচ্ছেদ এবং যুক্তি ও মানবতাবাদী বৌদ্ধ ধর্মের পুনর্জাগরণের আন্দোলন করবে না। শংকরাচার্য, রামানন্দ, চৈতন্য, রামমোহন, দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ্ণ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—কেউই বৌদ্ধ ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেননি। তাঁরা বরং বৈষ্ণব-ব্রাহ্ম-হিন্দু প্রভৃতি নামে বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের জাগরণ ঘটিয়েছেন যাতে ব্রাহ্মণ্যশ্রেণির আধিপত্য ও ভাবধারা অক্ষুণ্ণ থাকে। দ্বিতীয় কথা, ব্রাহ্ম সমাজের কোনো লোক, এমনকি তথাকথিত মহাপুরুষরাও তফসিলিদের উন্নয়ন ও রাজক্ষমতা চান নি। তাঁরা কেবল বাহ্য দরদ দেখিয়ে নিজেদের আধিপত্য অটুট রাখতে ব্যস্ত ছিলেন।

কাজেই, ব্রাহ্মণজাতিকে ব্রহ্মজ্ঞানী বা বৃহৎ জ্ঞানের অধিকারী বলা যায় না। খাঁটি ব্রহ্মজ্ঞানীরা (বৃহৎ জ্ঞানী) যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী হবেন। তাঁরা স্বর্গ-ঈশ্বর-দেব-দেবী বর্ণাশ্রম-মন্ত্র প্রভৃতি বিশ্বাস করবেন না। তাঁরা বস্তুবাদীই হবেন, তাঁরা বৌদ্ধ হবেন। ভারতের ব্রাহ্মণ সমাজ কোনোকালেই ব্রহ্মজ্ঞানী ছিল না, আজও না। তারা ব্রহ্মের নাম ভাঙিয়ে ব্রাহ্মণ সেজেছে এবং জনগণের উপর শাসন-শোষণ আধিপত্য বজায় রেখেছে। ধর্মের নামে ঝুড়িঝুড়ি অর্থহীন মন্ত্রতন্ত্র, অবৈজ্ঞানিক জাতিভেদ প্রথা প্রভতি ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করে চাল-কলা-দান-দক্ষিণা-প্রণামী-ইষ্টভৃতি বা খাট-বিছানা-ছাতা-জুতো-সোনা-গাভী ইত্যাদি আত্মসাৎ করা যায়, ব্রহ্মজ্ঞানী হওয়া যায় না।

ব্রাহ্মণরা কবে থেকে সংরক্ষণ ভোগ করছে

তফসিলিরা সংরক্ষণ ভোগ করছে, চারিদিকে এটাই প্রচারিত হয়ে থাকে। এবং তফসিলি সংরক্ষণের বিরুদ্ধে হাজারো প্রতিবাদ বা গালমন্দ শোনা যায়। বলা হয়—তফসিলিদের মেধা নেই, তফসিলিরা অযোগ্য, সংরক্ষণ আছে বলে তফসিলিরা চাকরি পাচ্ছে, তফসিলিদের জন্য জেনারেল ক্যাটেগরির ছাত্র-ছাত্রীরা সুযোগ পাচ্ছে না, তফসিলি সংরক্ষণের জন্য জাতপাত বিলুপ্ত হচ্ছে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পক্ষ থেকে এসব গালমন্দ বা অভিযোগ শুনে রীতিমত

ঘাবড়ে রয়েছে তফসিলি সমাজ (SC-ST-OBC)। তারা ভয়ে আত্মপরিচয় দিতে চায় না, লজ্জা পায়, অনেকে পদবী পাল্টে বর্ণচোরাদের দলে নামও লেখায়।

ঘটনা হল, তফসিলি সংরক্ষণের তিন হাজার বছর আগে ব্রাহ্মণ সহ উঁচুবর্ণের (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য) লোকেরা সংরক্ষণ ভুক্ত হয়েছে, আমরা কি সে রহস্য একবারও জানবার চেষ্টা করেছি? তফসিলিরা সংরক্ষণভুক্ত হয়েছে ১৯৩০/৩৫ সাল নাগাদ। আজও তফসিলি সংরক্ষণের বয়স একশো বছর হয়নি। অথচ, ব্রাহ্মণরা সংরক্ষণ ভোগ করছে সেই বৈদিক আমল থেকে। তাদের সংরক্ষণের বয়স তিন হাজার বছরেরও বেশি। রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করা দরকার।

আমরা সকলেই জানি, আদি ভারতীয় সিন্ধু হরপ্পা যুগে বর্ণাশ্রম আইন তৈরি হয়নি। হরপ্পোত্তর বৈদিকযুগে বহিরাগত আর্যরা বর্ণাশ্রম আইন নামক এক ডিভাইড এন্ড রুল ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ভারতে। বর্তমান হিন্দুধর্মে যে জাতিভেদ প্রথা বিদ্যমান তার জন্ম ওই বৈদিকযুগে বর্ণাশ্রম আইনের ঔরসে। আর্যদের মধ্যে ধূর্ত ও বুদ্ধিমান গোষ্ঠী ব্রাহ্মণরাই বর্ণাশ্রম আইন তৈরি করেছিল। এই আইনে আর্যরা তিন বর্ণে নামাঙ্কিত হয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য। পরাজিত ভারতীয়দের শূদ্র ও অতিশূদ্র বর্ণে পতিত করে দেওয়া হয়। বর্ণাশ্রম আইনে বলা হয় ব্রাহ্মণ - ক্ষত্রিয়-বৈশ্য—এই তিন আর্যবর্ণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এদের মধ্যে সবার উপরে থাকবে ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয় স্থানে ক্ষত্রিয় এবং তৃতীয় স্থানে বৈশ্য। শূদ্রের (SC-ST-OBC) স্থান সকলের নিচে। আইনে বলা হল—ব্রাহ্মণরা সমস্ত বিষয়ে সংরক্ষণ (Reservation) পাবে। অর্থাৎ শিক্ষার্জনের অধিকার, ধর্ম করার অধিকার, পৌরোহিত্যের অধিকার, শিক্ষাদানের অধিকার, সবই থাকবে ব্রাহ্মণদের দখলে। উপরন্তু ব্রাহ্মণের নির্দেশ মেনে রাজ্য চালাবে ক্ষত্রিয়রা। এ ছাড়া, ব্রাহ্মণরা আরো হাজারো সুযোগ সুবিধা পাবে যা অন্য বর্ণরা পাবে না। বিশেষ করে শূদ্ররা (SC-ST-OBC) কোনো অধিকারই পাবে না। তার প্রমাণ রাম কর্তৃক শম্বুক হত্যা। শূদ্র শম্বুক নিজ চেষ্টায় শিক্ষার্জন করেছিল। ব্রাহ্মণ বশিষ্টের নির্দেশে ক্ষত্রিয় রাজা রাম তাই শম্বুককে হত্যা করে। একলব্যও শূদ্রসন্তান। সে ধনুর্বিদ্যা অর্জন করেছিল। ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য এজন্য তার ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে নিয়ে পঙ্গু করে দিয়েছিল। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ থেকে শুরু করে আজও পর্যন্ত ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রনিধনের কোটি কোটি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

কাজেই, আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি বৈদিক যুগে আর্য ব্রাহ্মদের তৈরি বর্ণাশ্রম আইন আদতে ব্রাহ্মণ তথা আর্য তিনবর্ণের সংরক্ষণ আইন। অর্থাৎ

তারাই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাবে। বিপরীতে ওই আইনেই সেদিন অসংরক্ষিত (De-reserved) করে দেওয়া হয়েছিল শূদ্রদের (SC-ST-OBC) । তারই ক্ষতিপূরণ (Compensation) স্বরূপ বর্তমান ভারতের সংবিধানে তফসিলি সংরক্ষণ আইন গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান ভারতে ব্রাহ্মণ সহ উঁচুজাতের লোকেরা প্রায় সমস্ত বিষয়ে এগিয়ে রয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষা, রাজনীতি, চাকরি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, গান-বাজনা-সিনেমা-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে ব্রাহ্মণরা অনেকটাই এগিয়ে। এর মূলে রয়েছে তিন হাজার বছরের সংরক্ষণ নীতি। তারা কোনো যুগেই অস্পৃশ্য ছিল না। স্বভাবতই নিজেদের বংশ, জিন-জেনারেশন এবং অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটাতে তাদের কোনো অসুবিধাই হয়নি। বিপরীতে তফসিলিরা বহু পিছিয়ে। এর মূলে রয়েছে হাজার হাজার বছরের অস্পৃশ্যতা এবং ব্রাহ্মণদের দ্বারা পাশবিক নির্যাতন ও বঞ্চনা।

সুতরাং ব্রাহ্মণরা এবং অন্যান্য উঁচুবর্ণের লোকেরা যদি তফসিলি সংরক্ষণের বিরুদ্ধে গলা ফাটায় তাহলে তা চোরের মায়ের বড় গলাই বটে। 'বেটা সাধুবেশে পাকা চোর অতিশয়।' ব্রাহ্মণরা ধর্ম আর ভগবানকে খাড়া করে উঁচুবর্ণ সেজে সাধারণ মানুষের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করেছে বা আজও করে চলেছে।

ব্রাহ্মণরা সব বিষয়ে এগিয়ে আছে কেন?

ধর্ম থেকে রাজনীতি, চাকরি, শিক্ষা-সাহিত্য-চলচ্চিত্র-টিভি সিরিয়াল, গান-বাজনা-বক্তৃতা, লেখালেখি, সাংবাদিকতা—সমস্ত বিষয়েই ব্রাহ্মণরা এগিয়ে। অবশ্য গতর ঘামানো কৃষিকাজ, রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী, কামার, কুমোর, তাঁতি, হাঁড়ি, ডোম, মুচি, মেথর, মৎস্যজীবী প্রভৃতি হাজারো কাজে ব্রাহ্মণরা একেবারেই পিছিয়ে। ঘটনা হলো, ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রান্ত এমনই শক্তপোক্ত যে, ব্রাহ্মণদের কর্মগুলো সম্মানিত ও সুকর্ম বলে প্রচারিত হলেও শূদ্রদের কর্মগুলো সম্মানিত বা সুকর্ম বলে প্রচারিত হয় না। গতরঘামানো কাজের সঙ্গে জড়িত মানুষদের (SC-ST-OBC) হিন্দু ধর্মে নিচুজাত, ছোটজাত, ঘৃণ্যজাত, অমেধাজাত, শূদ্র, ম্লেচ্ছ,

অপমানব প্রভৃতি বলে চিহ্নিত করা হয়। ব্রাহ্মণরা 'মনুসংহিতা' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে যেমন মানুষে মানুষে উঁচু-নিচু জাতবিভাজন ঘটিয়েছে তেমনি কাজ-কর্মেও উঁচু-নিচু জাতবিভাজন ঘটিয়েছে। ব্রাহ্মণদের পরিচালিত হিন্দুধর্ম ও সমাজে তাই কৃষিকাজ প্রভৃতি কাজকে সম্মানের চোখে দেখা হয় না।

প্রশ্ন হল, ধর্ম থেকে রাজনীতি বা শিক্ষা-সাহিত্য-চাকরি প্রভৃতি বিষয়ে ব্রাহ্মণরা এতটা এগিয়ে গেল কিভাবে? এটা কি তাদের মেধাগত যোগ্যতার ফল?

বিষয়টি আদৌ তা নয়। বর্তমানে এটাকে মেধাগত যোগ্যতার ফল বলে মনে হলেও আদতে এর মধ্যে ছিল ধূর্ততা, শঠতা ও বদমায়েসী। অবশ্য এটাও একধরনের মেধা। চালাকি করে মানুষকে ঠকিয়ে পয়সা রোজগার করাটাও একধরনের মেধা।

ব্রাহ্মণদের ধূর্ততাই ব্রাহ্মণদের এগিয়ে দিয়েছে সকলের থেকে। সেটা হল ভগবান ও বর্ণাশ্রম আইন সৃষ্টি। ব্রাহ্মণরা ভগবানের নাম ভাঙিয়ে বর্ণাশ্রম আইন সৃষ্টি করেছে এবং নিজেদের উঁচুবর্ণ বলে প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে দাবি করেছে। তাদেরকে দান-ধন দিলে নাকি স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটবে, আত্মা শান্তি পাবে, পরবর্তী জনম সুখের হবে।

এককথায় ব্রাহ্মণরা বর্ণাশ্রম আইন তৈরি করে নিজেরাই সমস্ত সংরক্ষণ নিয়েছে সেই বৈদিকযুগে। তারা কোনো যুগেই 'অস্পৃশ্য' (Untouchable) ছিল না। বৈদিকযুগ, বৌদ্ধযুগ, গুপ্ত-সাতবাহন-পাল-সেন-মুঘল-ব্রিটিশ—কোনোযুগেই তারা অস্পৃশ্য ছিল না। সব যুগেই তারা শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে, সব বিষয়েই তারা এগিয়ে গেছে। বর্তমান ভারতে ব্রাহ্মণরা কতটা এগিয়ে রয়েছে তার মূলে বর্ণাশ্রম তথা ব্রাহ্মণ্যবাদী সংরক্ষণ নীতি। বিপরীতে, তফসিলিরা পিছিয়ে রয়েছে তার মূলে রয়েছে 'অস্পৃশ্যতা'। ব্রাহ্মণরা বর্ণব্যবস্থা তৈরি করে 'অস্পৃশ্য' করে দিয়েছিল মূলনিবাসী ভারতীয়দের। বৌদ্ধরা যতদিন রাজক্ষমতায় ছিল ততদিন তফসিলিজাতির পূর্বপুরুষগণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বৌদ্ধ ব্যতীত ব্রাহ্মণদের যুগ (গুপ্ত-সাতবাহন-সেন প্রভৃতি) এবং মুসলমানদের যুগে তফসিলিদের অস্পৃশ্য করে রাখা হয়েছিল। ব্রিটিশ আমলের মধ্যভাগে সার্বজনীন শিক্ষানীতি গৃহীত হয়। সেই দৌলতে অস্পৃশ্যরাও শিক্ষার আঙিনায় প্রবেশ করতে থাকে।

ব্রাহ্মণরা এতটা এগিয়ে গেছে এর নেপথ্যে আরও একটি কারণ আছে। সেটা হল তারা প্রচণ্ড স্বজাতিপ্রেমী জাতি। নিজেদের লোকজনদের উপরে

তোলার জন্য তারা প্রতিনিয়ত সচেষ্ট। সরকারি চাকরিতে, রাজনীতিতে, প্রাইভেট কর্ম প্রতিষ্ঠানে নিজেদের জাত, বংশ, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে নিয়োগ করার তদ্বির চালিয়ে যায়। তার প্রমাণ, তফসিলি সংরক্ষণের বিরোধিতা করা। ব্রাহ্মণরা তফসিলি সংরক্ষণের বিরোধিতা করে থাকে। এর প্রধান কারণ, তফসিলিদের পরিবর্তে তারা স্বজাতিদের চাকরি দিতে চায়। ব্রিটিশ আমলে চালু সার্বজনীন শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেছিল ব্রাহ্মণরা। তারা দেখেছিল, এই শিক্ষানীতির ফলে অস্পৃশ্যরাও শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। তারা তফসিলিদের ভোটাধিকারের বিরোধিতাও করেছিল। কারণ, রাজশক্তিতে একচেটিয়া ব্রাহ্মণরা থাকবে—এটাই ছিল তাদের মতলব।

অথচ, তফসিলি জাতির নির্বোধ অংশ সেই ব্রাহ্মণ জাতিকেই 'পুরোহিত' ও 'নেতা' বলে গ্রহণ করে চলেছে। ব্রাহ্মণরা তফসিলিদের মঙ্গল কামনা করে না, তফসিলিদের উন্নয়নও চায় না। উদার-নির্বোধ তফসিলিজাতি তা বুঝতে পারে না। মানুষ কুকুরকে নিকৃষ্টজীব বলে ঘৃণা করলেও অবলা কুকুর তা কি বোঝে? উল্টে প্রভুভক্ত দেখায়। ব্রাহ্মণরা তফসিলিজাতিকে প্রভুভক্ত অবলা কুকুরে পরিণত করে ফেলেছে।

ভারতে ব্রাহ্মণ-তোষণ চলছে

রাস্তা-ঘাটে, ট্রেনে-বাসে, অফিস-আদালতে, বিধানসভা-লোকসভা সর্বত্রই কান পাতলে শোনা যায় তফসিলিতোষণের কথা বা মুসলিমতোষণের কথা। ব্রাহ্মণ্য সমাজের লোকেরা তফসিলি ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ করে থাকে। তফসিলি বর্গের (SC-ST-OBC) নির্বোধ অংশ সেই ব্রাহ্মণদের গলায় গলা মিলিয়ে মুসলিমতোষণের অভিযোগ করে। ব্রাহ্মণরা 'তফসিলি তোষণ' বলে তফসিলিদের বিরোধিতা করছে, এটা কি তফসিলিদের নির্বোধ অংশ বুঝতে চাইছে?

ঘটনা হল, ব্রাহ্মণরা কাঁচের ঘরে বাস করে অন্যের দিকে ঢিল ছুঁড়ছে যাতে তাদের নিজেদের ঘরের দিকে কেউ ঢিল না ছুঁড়তে পারে। ভারতে ব্রাহ্মণদের তোষণ করা হচ্ছে সেই বৈদিকযুগ থেকে এবং আজও। ব্রাহ্মণকে উঁচুবর্ণ বলে

শ্রদ্ধা করা, পুরোহিত রূপে মান্যতা দেওয়া, প্রচুর দান-ধন দেওয়া, ব্রাহ্মণের পা ধুয়ে জল খাওয়া, চাকরিতে বা রাজনীতিতে ব্রাহ্মণকে খুশি করে নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা নেওয়া—এসবই ব্রাহ্মণ তোষণের দৃষ্টান্ত। হিন্দুসমাজের নিচে অবস্থিত তফসিলিরাই (SC-ST-OBC) ব্রাহ্মণ তোষণ করছে।

ভারতে ব্রাহ্মণরা মাত্র ৩.৫ শতাংশ (দ্রঃ মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট)। অথচ, তারাই সবকিছুর মাতব্বর। ধর্ম থেকে রাজনীতি, শিক্ষা-চাকরি-সাহিত্য-সংস্কৃতি সবেতেই তাদের আধিপত্য। এর মূলে রয়েছে নিচে অবস্থিত তফসিলি বর্গের (SC-ST-OBC) মানুষদের ব্রাহ্মণভক্তি বা ব্রাহ্মণতোষণ নীতি। ব্রাহ্মণকে 'নেতা' বা 'পুরোহিত' রূপে মেনে নেওয়ার অর্থ ব্রাহ্মণকে তোষণ করা। ব্রাহ্মণরা কিন্তু এভাবে তফসিলি বা মুসলিমদের তোষণ করে না। নেহাৎ ক্ষমতার শীর্ষে থাকবার ধান্দায় ছিটেফোঁটা ছুঁড়ে দেয় মুসলিম ও তফসিলিদের দিকে। সমাজের নির্বোধ অংশ একেই মুসলিমতোষণ বা তফসিলিতোষণ বলে প্রচার করে থাকে। আদতে ব্রাহ্মণতোষণই চলছে ভারতে। তফসিলিরা যতদিন স্বশিক্ষিত, সুশিক্ষিত এবং আত্মসচেতন না হবে ততদিন তারা ব্রাহ্মণতোষণ করবে আর উল্টে ব্রাহ্মণদের গালাগালিও শুনবে। তফসিলির এতই পিছিয়েপড়া জাত যে ব্রাহ্মণদের গালাগালি বুঝতেও পারে না।

বর্তমান সংবিধানে কারা তফসিলি জাতি

'তফসিলি' শব্দটি ফারসী ভাষা থেকে বাংলা ভাষার অভিধানে গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ—তালিকা, ক্রম, ক্রমাঙ্ক, সূচি, অনুসূচি ইত্যাদি। ইংরাজী প্রতিশব্দ—লিস্ট বা সিডুল্ড (List/Scheduled) ।

কারা তফসিলিজাতি? এ প্রশ্নের সাংবিধানিক উত্তর হল সংবিধানে এসসি-এসটি-ওবিসি (SC-ST-OBC) নামে চিহ্নিত জনগোষ্ঠী একত্রে তফসিলি বা তালিকাভুক্ত জাতি।

তফসিলি জাতির ঐতিহাসিক পরিচয় এরা প্রাক আর্য ভারতীয়দের বংশধর। বর্তমানে মূলনিবাসী, দলিত, বহুজন, আদিভারতীয় প্রভৃতি শব্দ-ভাষায় তফসিলিরা পরিচিত। তফসিলিরা অনার্যজাতি।

আর্যরা বর্ণাশ্রম আইন (ডিভাইড এন্ড রুল অ্যাক্ট) তৈরি করে ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি সব বিষয় থেকে হটিয়ে দিয়েছিল মূলনিবাসীদের। তাদেরকে শূদ্র বা অতিশূদ্র বর্ণে পতিত করে দিয়েছিল। বিপরীতে ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি সব বিষয়ের অধিকার তথা সংরক্ষণ রেখেছিল নিজেদের হাতে। এ জন্য আর্য-ব্রাহ্মণরা এখন সবদিকেই এগিয়ে রয়েছে। বিপরীতে পিছিয়ে পড়েছে মূলনিবাসীরা। এজন্য বর্তমান ভারতের সংবিধানে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ (Compensation) দেওয়ার উদ্দেশে তফসিলি সংরক্ষণ আইন গৃহীত হয়েছে। আর্যরা যদি বর্ণব্যবস্থা তৈরি না করত তাহলে বর্তমানে এভাবে তফসিলি সংরক্ষণ আইনও গ্রহণ করতে হত না সংবিধানে। অতএব, তফসিলি সংরক্ষণের জন্য একমাত্র দায়ী ব্রাহ্মণরা এবং তাদের তৈরি বর্ণাশ্রম আইন (Caste divide law)।

তফসিলিরা কবে সংরক্ষণভুক্ত হয়েছে

আর্য-গোষ্ঠীর তিন বর্ণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যরা বর্ণাশ্রম আইন মোতাবেক সংরক্ষণভুক্ত হয়েছে বৈদিকযুগে, আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে। বিপরীতে তফসিলি তথা মূলনিবাসী ভারতীয়দের সংরক্ষণ প্রদান শুরু হয়েছে ১৯৩০/৩৫ সালে, ব্রিটিশ আমলে। তিনটি স্তরে তফসিলিদের (SC-ST-OBC) সংরক্ষণ আইন গৃহীত হয় সংবিধানে।

১৯৩০/৩১/৩২ সালে লন্ডনে আয়োজিত গোলটেবল বৈঠকে তফসিলি তথা অস্পৃশ্যদের নানারকম অধিকার আদায়ের আন্দোলন করেন আম্বেদকর। ব্রিটিশ সরকার তাঁর দাবি মেনে ১৯৩৫ সালে অস্পৃশ্যদের একাংশকে তফসিলিজাতি (SC) আখ্যা দেয় এবং ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে রাজনীতিতে তফসিলি সংরক্ষণ সর্বপ্রথম কার্যকরী হয়। সরকারি চাকরিতেও এ সময় থেকে তফসিলি সংরক্ষণ কম-বেশি কার্যকরী হয়। এসটি (ST) আদিবাসী শ্রেণিকে সংরক্ষণ প্রদান করা হয় ব্রিটিশ পরবর্তী ১৯৫০ সালের সংবিধানে। ওবিসি (OBC) চিহ্নিত জনগোষ্ঠীগুলোকে সংরক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা হয় ১৯৯০ সালে প্রকাশিত মণ্ডল কমিশনের প্রস্তাব থেকে।

বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ পরবর্তী ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে তফসিলি (SC-ST) সংরক্ষণ কার্যকরী হয় ১৯৫২/৫৩ সাল থেকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকরিতে তফসিলি (SC-ST) সংরক্ষণ কার্যকরী হয় ১৯৭৬/৭৭ সাল থেকে। কেন্দ্র বা রাজ্যে ১৯৯০/৯২ সালের পর ওবিসি সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণদের পাশাপাশি কায়স্থ-বৈদ্যরা সংরক্ষণ পেয়েছে গুপ্তযুগ, সেনযুগ প্রভৃতি সময় থেকে।

সুতরাং তফসিলি সংরক্ষণের (SC-ST-OBC) বিরুদ্ধে কথা বলবার আগে জানা দরকার ব্রাহ্মণ বা অন্যরা কবে সংরক্ষণ পেয়েছে তার ইতিহাস।

তফসিলি সংরক্ষণ কি ও কেন, ক'জন জানতে চাইছেন

তফসিলি ভুক্ত (SC-ST-OBC) অধিকাংশ শিক্ষিত লোক সংরক্ষণের অর্থ বোঝেন না, বোঝার চেষ্টাও করেন না। তাঁরা শুধু এটাই বোঝেন যে, এটা ব্যক্তিগত চাকরি, পদোন্নতি, গাড়ি-বাড়ি, ভ্রমণ-বিলাস-ব্যসনের হাতিয়ার। তফসিলিভুক্ত মার্কসবাদী লোকেরা আবার এটাকে জাতপাত বলেও মনে করে থাকেন।

তফসিলি সংরক্ষণ সম্পর্কে প্রথমেই জানা দরকার, এই সংরক্ষণ কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এটা সমষ্টিগত সম্পত্তি। জাতীয় সম্পত্তি। তফসিলিভুক্ত কোনো ব্যক্তির 'মুখ' দেখে কাস্ট-সার্টিফিকেট দেওয়া হয় না। বিডিও বা এসডিও অফিসে আবেদন করা দরখাস্তে গোষ্ঠীর (Sub-caste) নাম লিখতে হয়। আবেদনকারী ব্যক্তি পৌণ্ড্র, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, বেদিয়া, মুণ্ডা প্রভৃতি কোনো একটি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কিনা, তা উল্লেখ করতে হয় দরখাস্তে। এই গোষ্ঠী নাম না থাকলে তাকে কাস্ট-সার্টিফিকেট দেওয়া হবে না।

অর্থাৎ তফসিলি সংরক্ষণ নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে তার গোষ্ঠীকে। কাজেই, তফসিলি সংরক্ষণের কোটায় সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত

ব্যক্তিকে প্রথমেই বুঝতে হবে তিনি তাঁর গোষ্ঠীকে দেওয়া সংরক্ষণ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, তিনি ওই গোষ্ঠীর একজন শিক্ষিত প্রতিনিধি।

ব্রিটিশ আমলে আম্বেদকর এবং আরো অনেক তফসিলি নেতৃত্ব এই সংরক্ষণের আন্দোলন করেছিলেন। অবশ্য, তাঁদের নিজেদের কোনো তফসিলি-সার্টিফিকেট ছিল না। তাঁরা সংরক্ষণের কোনো সুযোগও লাভ করেননি। তবুও তাঁরা স্বজাতির উন্নয়ন ও স্বাধীনতা অর্জনের স্বার্থে এই আন্দোলন করেছিলেন। সংরক্ষণ সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল দু'রকম ঃ (১) প্রতিনিধিত্ব মূলক (Representation) এবং (২) ক্ষতিপূরণমূলক (Compensation)। তফসিলি সংরক্ষণের কোটায় শিক্ষা, স্টাইপেন্ড, চাকরি, পদোন্নতি, রাজনীতিতে ভোটে দাঁড়ানো প্রভৃতি সুযোগ যাঁরা নেবেন তাঁরা স্বজাতি সমাজের প্রতিনিধি রূপে কাজ করবেন। কিভাবে প্রতিনিধিত্ব করবেন? এ বিষয়ে প্রথম বক্তব্য হল, ব্রাহ্মণদের দ্বারা সৃষ্ট বর্ণাশ্রম আইনের অভিশাপে অস্পৃশ্যতার শিকার হতে হয়েছে তফসিলি ভুক্ত গোষ্ঠীকে। অতএব, প্রথম কাজ হল, ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্ম ও ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্য প্রথা বর্জন করা। বুঝতে হবে, ব্রাহ্মণরা কখনোই তফসিলিজাতির মঙ্গলকারী জাতি নয়। তফসিলিভুক্ত শিক্ষিত মানুষকে তাই ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্ম ও তার যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে। সংগঠন করতে হবে, অর্থ দান করতে হবে। রাজনৈতিক ভাবেও ব্রাহ্মণদের তৈরি ডান-বাম দল বর্জন করতে হবে এবং আম্বেদকরপন্থী রাজনীতিকে শক্তিশালী করতে হবে। ধর্মীয় ভাবে যুক্তি ও মানবতাবাদী বৌদ্ধ ধর্মকে প্রচার করতে হবে। এভাবেই প্রতিটি তফসিলি ব্যক্তি প্রতিনিধিত্ব করবেন। নিজের সাধ্যমতন সময়, শ্রম, অর্থ ও বুদ্ধি দিয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে।

সংরক্ষণের দ্বিতীয় বিষয় ক্ষতিপূরণমূলক। আসমুদ্র হিমাচল ভারতভূমি বহিরাগত মুঘল-পাঠান-ব্রিটিশ প্রভৃতি রাজশক্তির দ্বারা শাসিত শোষিত হলেও বৃহত্তর হিন্দুসমাজ মূলত শাসিত হয়েছে বা আজও হয়ে চলেছে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্মের দ্বারা। এটাও বহিরাগত আর্যদের তৈরি ধর্ম ও রাজনীতি। আর্যরা এদেশের ভূমিসন্তানদের (SC-ST-OBC) যুগযুগ ধরে ভগবান আর বর্ণাশ্রম আইন খাড়া করে শাসন-শোষণ-অত্যাচার করেছে এবং এখনও করে চলেছে। এর ফলে তীব্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তফসিলিরা। আধুনিক উন্নয়নকামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সংরক্ষণ তাই কারোর দয়া-দাক্ষিণ্য- কৃপা-করুণা-ভিক্ষা নয়।

এটা ভারতীয় ভূমিসন্তানদের (SC-ST-OBC) নায্য অধিকার। এই সংরক্ষণের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলার অধিকার নেই ব্রাহ্মণদের বা তাদের চামচাদের। কারণ, তফসিলি সংরক্ষণের আন্দোলন তারা করেনি। ভারতের ভূমিসন্তানরা তাদের নিজস্ব অধিকার নেবে, এতে আপত্তি কেন বহিরাগত আর্য বা অন্যদের? ভারতে মোট ভোটদাতার ৮৫ শতাংশ জনগণ তফসিলিবর্গের। অতএব, সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার অগ্রগণ্য।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, তফসিলি সংরক্ষণের নেপথ্য কারণ এবং তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন নন তফসিলিবর্গেরই অধিকাংশ শিক্ষিতলোক। তফসিলিদের বহু লোক শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইএএস, ডব্লু বিসিএস, ব্যাঙ্ককর্মী, রেলকর্মী, জীবনবীমা কর্মী বা অন্যান্য কর্মী হয়েছেন। এঁদের ৯৯ শতাংশ লোক সংরক্ষণের অর্থ বোঝেন না, বুঝতেও চান না। এঁরা সংরক্ষণকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করে চলেছেন। এর ফলে, এঁদের উত্তর প্রজন্ম ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকদের দ্বারা প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ন্যূনতম এই ধারণাটিও তফসিলিদের মধ্যে নেই। বন্যজন্তুকে 'সংরক্ষণ' দেওয়া হয়। অভয়ারণ্য তৈরি করে তাদের বাসস্থান, খাদ্য, চিকিৎসা, নিরাপত্তা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। নির্বোধ জন্তুরা সংরক্ষণের অর্থ বোঝেনা। বোঝার কথাও নয়। কিন্তু শিক্ষিত মানুষেরা যদি না বুঝতে চান, তাহলে কি বলা হবে এঁদের? ব্রাহ্মণরা কিন্তু আত্মসচেতন ও স্বজাতি সচেতন জাতি। শাসন ক্ষমতায় থাকার জন্য তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে। তারা সংখ্যালঘু (৩.৫%)। অথচ, ধর্ম থেকে রাজনীতি, শিক্ষা-চাকরী-সাহিত্য-সংস্কৃতি-গান- বাজনা-সিনেমা —সর্বত্রই তাদের কর্তৃত্ব বা আধিপত্য। কারণ, তারা পরিশ্রমী ও স্বজাতিসচেতন। তারা প্রত্যেকেই স্বজাতির প্রতিনিধি রূপে কাজ করে। তফসিলি বর্গের শিক্ষিত মানুষদের উচিত স্বজাতি সচেতন হওয়া। তা না হলে চরমতম খেসারত দিতে হবে তাদের সন্তান সন্ততিদেব।

সংরক্ষণ প্রাপক ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে লজ্জাবোধ নেই

'ব্রাহ্মণ' শব্দটিই সংরক্ষণ বাচক শব্দ। ব্রাহ্মণবংশে জন্মালে হিন্দু সমাজে তার নানাবিধ অধিকার জন্মসূত্রে জুটে যায়, যেটা তফসিলিবর্গের (SC-ST-OBC) ক্ষেত্রে জোটে না। ব্রাহ্মণরা জন্মসূত্রে পৌরোহিত্যের অধিকারী। জনগণ তাদেরকে 'ধর্মগুরু' হিসেবে সম্মান দেয়। আত্মপরিচয় প্রদান, নাম-পদবী প্রকাশ, বংশের ইতিহাস বর্ণনা—কোথাও ব্রাহ্মণরা লুকোছাপ করে না। ব্রাহ্মণরা নিজেদের পদবী পাল্টে আত্মগোপন করে না। হিন্দুসমাজে নানাবিধ অন্যায় অত্যাচার-ষড়যন্ত্র ও কুসংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণজাতির নাম জড়িত। অবাস্তব ঈশ্বর ও দেব-দেবী তত্ত্ব, স্বর্গ-আত্মা-পুনর্জন্ম তত্ত্ব, মন্ত্র-তন্ত্র-পুজো-যজ্ঞ, বৌদ্ধ বা শূদ্র কৃষক- শ্রমিকদের উপর অত্যাচার, শাসন-শোষণ-বঞ্চনা, বর্ণাশ্রম ও জাতব্যবস্থা, সতীদাহ প্রথা, পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা, নারীর বাল্যবিবাহ প্রথা, শূদ্র ও নারীকে সমস্ত অধিকার থেকে দূরে সরিয়ে রাখা, শূদ্রের কানে গরম তেল দেওয়া, জিহ্বা কেটে নেওয়া, শল্য চিকিৎসা বন্ধ করা, সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ করা, বৌদ্ধ মঠ ভাঙচুর ও দখল করে হিন্দু মন্দিরে পরিণত করা প্রভৃতির সঙ্গে ব্রাহ্মণরাই জড়িত।

একদিকে সংরক্ষণগত সুযোগসুবিধা ভোগ ও সম্মান, টাকা-পয়সা ভোগ অন্যদিকে নানাবিধ অন্যায়-অত্যাচার কুসংস্কার ও ষড়যন্ত্র। এতকিছুর পরেও ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে আত্মপরিচয় সংকট নেই, লজ্জাবোধ নেই, পাপবোধ নেই। অথচ, তফসিলিবর্গের (SC-ST-OBC) ইতিহাসে এ জাতীয় কোনো দুর্নীতি, কুসংস্কার বা অত্যাচার নেই। অন্তত, আধ্যাত্মিক কুসংস্কারের জনক হিসেবে তফসিলিদের নাম আসবে না। ভারতে ব্রাহ্মণ ও বহিরাগত মুসলমান-খ্রিস্টানদের অত্যাচারের কাহিনী শোনা যায়, বৌদ্ধদের সম্পর্কে এ জাতীয় কোনো অভিযোগ নেই।

এ হেন তফসিলিবর্গ, যাঁদের পূর্বপুরুষরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল, যারা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচারের শিকার হয়েছিল এবং সে কারণেই আজ তাদেরকে তফসিলিভুক্ত হতে হয়েছে। কোনো অন্যায়-অত্যাচার দুর্নীতির সঙ্গে তফসিলিদের নাম জড়িয়ে না থাকলেও আজ তারা আত্মপরিচয় গোপন করে চলে। সংরক্ষণ পেয়ে হীনমন্যতায় ভোগে। অনেকে পদবী পাল্টে কাপুরুষের মতন আত্মগোপন করে।

তফসিলিদের মধ্যে এই লজ্জাবোধ আদৌ যুক্তিসম্মত নয়। ব্রাহ্মণ সহ সাধারণ শ্রেণির মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ১৫/২০ শতাংশ। তারা

ব-কলমে আজও সংরক্ষণ ভোগ করছে ৫০ শতাংশ। গত কুড়ি বছর আগেও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সরকারি চাকরির ৮০ শতাংশ ভোগ করত। বিপরীতে বর্তমানে ৮০/৮৫ শতাংশ এসসি-এসটি-ওবিসিরা সংরক্ষণ পেয়েছে মাত্র ৫০ শতাংশ। কুড়ি বছর আগে এরা পেয়েছিল মাত্র ১০/১২ শতাংশ। এই হল তফসিলি সংরক্ষণের সর্বভারতীয় চিত্র।

এর পরেও যদি তফসিলিরা (SC-ST-OBC) লজ্জাবোধ করে, যদি আত্মগোপন করে চলে, যদি নিজেদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ না হয় তাহলে তফসিলিদের মতন সহজ-সরল-কাপুরুষ ও নির্বোধ জাতি পৃথিবীতে বিরল বলে ধরে নিতে হবে। হিন্দুসমাজে যেন তফসিলিদের জন্ম হয়েছে ব্রাহ্মণ তোষণ বা ব্রাহ্মণের পদলেহনের জন্য। এ জন্য অবশ্যই দায়ী তফসিলি বর্গের শিক্ষিতশ্রেণি।

ব্রাহ্মণরা কেন দরিদ্রতার ভিত্তিতে সংরক্ষণ দাবি করছে

বর্তমান ভারতের সংবিধানে যে তফসিলি সংরক্ষণ চালু আছে তা জাতভিত্তিক সংরক্ষণ, অর্থাৎ, কাস্ট-সার্টিফিকেটে পৌণ্ড্র, নমঃশূদ্র, বাগদি, বেদিয়া, মুণ্ডা প্রভৃতি গোষ্ঠীনাম (Sub Caste) উল্লেখ থাকে। ব্রাহ্মণরা নিজেরা যুগযুগ ধরে জাতভিত্তিক সংরক্ষণ ভোগ করলেও তারা তফসিলি সংরক্ষণের বিরুদ্ধে জাতের অভিযোগ তুলছে। তারা দরিদ্রতা ভিত্তিক সংরক্ষণ প্রণয়নের দাবি করছে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, তারা এ ধরনের দাবি তুলছে কেন? তারা কি সত্যিই গরীবদরদী? তারা কেন ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণের বিরোধিতা করছে না? দুঃখের বিষয়, ব্রাহ্মণদের এই গরীবদরদী মুখোশ দেখে তফসিলিবর্গের (SC-ST-OBC) সহজ-সরল-উদার ও নির্বোধ মানুষেরাও দরিদ্রতা ভিত্তিক সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি দেখাচ্ছে। বিশেষ করে মার্কসবাদী দলের অধিকাংশ তফসিলিব্যক্তি প্রচলিত তফসিলি সংরক্ষণের বিরোধিতা করে থাকে।

ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে একটি বিষয় গোড়াতেই জানতে হবে যে, তারা যখন জাতভিত্তিক বর্ণাশ্রম আইন চালু করেছিল, সেখানেও ছিল তাদের নিজেদের স্বার্থ। তেমনি এখন দরিদ্রতার ভিত্তিতে যে সংরক্ষণ তারা দাবি করছে, সেখানেও তাদের সেই স্বার্থ লুকিয়ে রয়েছে।

ধরা যাক, দরিদ্রতার ভিত্তিতে সংরক্ষণ আইন হল। এক্ষেত্রে সেই ব্রাহ্মণ সহ তথাকথিত সাধারণ শ্রেণির প্রার্থীরা বা-কলমে 'দরিদ্র' সাজবে, বি.পি.এল ভুক্ত সার্টিফিকেট বের করবে। চাকরির ইন্টারভিউ বোর্ডে এরাই বেশি সুযোগ-সুবিধা নেবে। কারণ, ইন্টারভিউ বোর্ডে পরীক্ষক সেজে বসে রয়েছে তাদের জাতভাইরা, চাকরি ব্যবস্থার পরিচালক তারা। রাজনীতি বা সরকারের দণ্ডমুণ্ড কর্তারাই ব্রাহ্মণ সমাজের লোক। সেখানে দরিদ্র মণ্ডল-নস্কর-গায়েন-মিস্ত্রী - সরদার পদবীধারীরা গেলে তাদেরকে হটিয়ে চাকরি দেওয়া হবে দরিদ্র চ্যাটার্জী-ব্যানার্জী-মুখার্জী-দত্ত-মিত্র-সেনদের।

ব্রাহ্মণরা এই গোপন উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই দরিদ্রতা ভিত্তিক সংরক্ষণের দাবি তুলেছে। সমাজের গরীব, পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নের জন্য তারা আদৌ ভাবিত নয়।

দরিদ্রতা ভিত্তিক সংরক্ষণ চালু করার আগে প্রথমে তিনটি জিনিস দরকার ঃ (১) সংখ্যাগরিষ্ঠ (৮৫%) তফসিলি বর্গের মানুষদের দ্বারা পরিচালিত রাজনীতি ও সরকারগঠন, (২) পদবী প্রথার ধ্বংস এবং (৩) বর্তমানে তফসিলি সংরক্ষণ চালু রেখে এর বাইরে অন্তত ১০ শতাংশ সংরক্ষণ সাধারণ শ্রেণির দরিদ্রের জন্য দরিদ্রতা ভিত্তিক করা। কেন্দ্র বা রাজ্যে যতদিন ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকদের দ্বারা রাজনীতি চলবে ততদিন দরিদ্রতা ভিত্তিক সংরক্ষণ ফলপ্রসু হবে না। মন্দির-মসজিদ-গীর্জা মার্কা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই জাতব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে। সমাজে এগুলো জিইয়ে রেখে দরিদ্রতার বিরুদ্ধে প্রকৃত সংগ্রাম হবে না। ভারতের মার্কসবাদী দল ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত। এ কারণে তারা বর্ণতন্ত্র বা ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলে না। তারা মার্কসবাদের আড়ালে সেই ব্রাহ্মণ্যবাদই চালিয়ে যাচ্ছে। আম্বেদকরপন্থী এবং দলিত-অনগ্রসরদের নেতৃত্বাধীন রাজনীতি ব্যতীত অন্যান্য বাম-ডান দলই ব্রাহ্মণ্যবাদী তথা হিন্দুত্ববাদী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রাহ্মণরা কত ধরনের সংরক্ষণ ভোগ করছে

হিন্দু ধর্ম ও সমাজে এবং ভারতে ব্রাহ্মণরা নানাধরনের সংরক্ষণ ভোগ করছে সেই বৈদিক আমল থেকে। তারা কত ধরনের সংরক্ষণ ভোগ করেছে এবং আজও ভোগ করছে তার কিছু নমুনা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হল—

১. বর্ণাশ্রম আইনে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

ভারতে আর্য-আক্রমণের আগে সিন্ধু-হরপ্পা যুগে বর্ণাশ্রম আইন (Castism Act) ছিল না। বহিরাগত আর্যরাই বর্ণাশ্রম আইন চালু করে তাদের বৈদিকযুগে। আর্যরা তিন বর্ণে চিহ্নিত হয়—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য। পরাজিত ভারতীয়দের শূদ্র ও অতিশূদ্র বর্ণে পতিত করে দেওয়া হয়। ভারতে আর্য-আক্রমণ ঘটেছে খ্রিস্টপূর্ব দেড়হাজার বছর আগে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে।

আর্যরা বর্ণাশ্রম আইনের প্রবর্তক। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে—পৃথিবীর সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্ম। তার মুখ থেকে ব্রাহ্মণের জন্ম, বাহু থেকে জন্ম ক্ষত্রিয়ের, উরু থেকে জন্ম বৈশ্যের আর পা থেকে জন্ম শূদ্রেরঃ ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।। (১০ম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত, ১২ সংখ্যক শ্লোক)।

একই কথা বলা হয়েছে 'মনুসংহিতা' নামক ব্রাহ্মণ্যবাদী সংবিধানেও—লোকনাম্ভ বিবৃদ্ধার্থং মুখবাহুরূপাদতঃ। ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ।। (১ম অধ্যায় ৩১ সংখ্যক শ্লোক)। বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশ ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৫ ও ৬ সংখ্যক শ্লোকেও একই কথা বলা হয়েছে।

মোট কথা, বর্ণাশ্রম আইন হল ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা বলবৎ করার আইন এবং বিপরীতে শূদ্র তথা তফসিলিদের (SC-ST-OBC) অসংরক্ষিত তথা

বঞ্চিত করার আইন। ব্রাহ্মণরা ব্রহ্মের মুখজাত বলে নিজেদের দাবি করে শিক্ষা, পৌরোহিত্য, দানগ্রহণ, পরামর্শ দান, অর্থ সঞ্চয় প্রভৃতি বিষয়ে সংরক্ষিত হয়েছে বা ভোগ করার অধিকারী হয়েছে। বর্তমান ভারতে তারা বিভিন্ন বিষয়ে এগিয়ে গিয়েছে, এর নেপথ্যে রয়েছে তিন হাজার বছর ধরে বর্ণাশ্রম আইনের সংরক্ষণনীতি ভোগ করার ফল। বিপরীতে শূদ্র তথা তফসিলিরা (SC-ST-OBC) পিছিয়ে পড়েছে, এরও মূলে রয়েছে ওই বর্ণাশ্রম আইনের অভিশাপ, যার দ্বারা অস্পৃশ্য তথা অসংরক্ষিত (De-reserved) করে দেওয়া হয়েছিল শূদ্র তথা মূলনিবাসী ভারতীয়দের।

২. জাতি তত্ত্বে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

হিন্দু ধর্ম ও সমাজ বর্ণাশ্রম আইনে বিভক্ত। বর্ণ বা গোষ্ঠীগুলো উঁচু-নিচু জাতে চিহ্নিত। ব্রাহ্মণ বর্ণ সবার উপরের জাত, দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়, তৃতীয় বৈশ্য এবং চতুর্থ বর্ণ শূদ্র। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণরা জাতি তত্ত্বে সংরক্ষিত জাতি। আর্য তিন বর্ণের মধ্যেও তারা একেবারে উপরের জাতি। তাদের নির্দেশ বা পরামর্শ মতো চলতে হবে নিচের বর্ণদের, এটাই বর্ণাশ্রম আইনের ফতোয়া।

কেউ কেউ শ্রীকৃষ্ণের বাণী (গীতা) আউড়ে দাবি করেন, বর্ণাশ্রম আইন জন্মভিত্তিক নয়, কর্মভিত্তিক। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ'। (চতুর্থ অধ্যায়, ১৩ সংখ্যক শ্লোক)।

এই বাণীটি শ্রীকৃষ্ণের নামে চালানো হচ্ছে গীতায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সত্যিই কি এই বাণীর স্রষ্টা? স্বয়ং তিনি শূদ্র যদু বংশীয়, অসুর বা কংসাসুর তাঁর মামা। অতএব তিনি আর্য নন, অনার্য। ইতিহাস বলছে, আর্যরাই বর্ণাশ্রম আইনের জনক।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, বর্ণব্যবস্থা কর্মভিত্তিক না জন্মভিত্তিক? বলা হয়, বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হয়েও ব্রাহ্মণ্যত্ব অর্জন করেছিলেন?

আমার মনে হয় এ তথ্য ভুল। তার প্রমাণ, জন্মভিত্তিক শূদ্র শম্বুক নিজচেষ্টায় শিক্ষার্জন করলেও তাঁকে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় স্বীকৃতি দূরের কথা, তাঁকে

খুন করে দিয়েছিলেন রাম (দ্রঃ রামায়ণ)। একই ঘটনা শূদ্র একলব্যের ক্ষেত্রেও। নিজ চেষ্টায় তিনিও ধনুর্বিদ্যা অর্জন করেছিলেন। তিনি শূদ্র বলে ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য তাঁকে শিক্ষা দিতে চাননি। এহেন স্বশিক্ষিত একলব্যের ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন দ্রোণাচার্য। কর্ণ জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয় সন্তান হয়েও নিচুজাত জেলের ঘরে পালিত হওয়ার জন্য দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভা থেকে তাঁকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। এ কালের শ্রেষ্ঠ হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দও (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) জন্মসূত্রে কায়স্থ শূদ্র হওয়ার জন্য পৌরোহিত্যের (ব্রাহ্মণ্যত্ব) অধিকার পাননি।

কাজেই, জাতব্যবস্থা কোনোকালেই গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে ছিল না, তা জন্মভিত্তিকই ছিল। কর্মভিত্তিক হলে শম্বুক-একলব্য-কর্ণ-বিবেকানন্দরা এভাবে খুন বা অপমানিত হতেন না। বিশ্বামিত্র হয়ত একালের বিবেকানন্দের মতন একজন ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রচারকারী সন্ন্যাসী, তিনি পুরোহিত হতে পারেননি।

৩. জাত পরিচিতিতে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

হিন্দু সমাজে একমাত্র ব্রাহ্মণজাতিই তার জাতপরিচয় নিয়ে মাথা উঁচু করে আছে, অন্যদের সে অধিকার নেই। অন্যরা, বিশেষ করে শূদ্রজাতি (SC-ST-OBC) যদি তাদের জাত পরিচিতি দিতে চায়, সমাজ সেটাকে 'জাতপাত' বলে কটাক্ষ করে থাকে। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের জাত পরিচয়টাই একমাত্র সংরক্ষিত বা সুরক্ষিত। অন্যদের জাতপরিচয় নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না অথবা প্রয়োজন বোধ করে না। তার প্রমাণ ঃ (১) রামমোহন (বন্দ্যোপাধ্যায়), বিদ্যাসাগর (বন্দ্যোপাধ্যায়), রবীন্দ্রনাথ (কুশারী বা ঠাকুর), শরৎচন্দ্র (চট্টোপাধ্যায়), বঙ্কিমচন্দ্র (চট্টোপাধ্যায়), রামকৃষ্ণ (চট্টোপাধ্যায়) প্রমুখের জীবনীতে সগৌরবে লেখা হয় তাঁদের 'ব্রাহ্মণ' পরিচিতির কথা। সদবংশ, উচ্চবংশ, বনেদি বংশ ইত্যাদি উচ্চপ্রশংসা লক্ষ করা যায়। (২) পুজো-বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি কর্মে পুরোহিত ব্রাহ্মণ ব্যতীত উপস্থিত মানুষদের কোনো জাতিপরিচয় নেই। উপস্থিত অতিথিদের বলা হয় আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি পরিচিতি। এরা কোন জাতের অতিথি, সে

ধরনের কোনো পরিচিতি নেই, হয়ত প্রয়োজনও নেই। কিন্তু 'ব্রাহ্মণ' পরিচিতি সর্বত্রই উল্লিখিত। (৩) শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-ভোজনের কথা লেখা হয় নিমন্ত্রণ কার্ডে, অন্যদের বেলায় লেখা হয় অতিথি আপ্যায়ন। অতিথিদের জাতপরিচয় কোথাও উল্লিখিত হয় না। (৪) পুজো-বিবাহ-শ্রাদ্ধ বাড়িতে 'ব্রাহ্মণ' এসেছে কিনা কিংবা কখন ব্রাহ্মণ আসবে, এ ধরনের প্রশ্ন তোলা হয়। 'ব্রাহ্মণ' একটি জাতি, তার উল্লেখ করেই সবাই তাকে চিহ্নিত করে। কিন্তু উপস্থিত অতিথিদের বেলায় সে ধরনের জাতপরিচয় নেই। (৫) শ্রাদ্ধমন্ত্রে 'ব্রাহ্মণ দেবায় নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করে জিনিস দেওয়া হয়। (৬) ব্রাহ্মণদের তৈরি ও পরিচালিত কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম, তৃণমূল প্রভৃতি দলকে মূলস্রোতের দল বলে প্রশংসা করা হয় কিন্তু কাঁশিরাম-মায়াবতী-মুলায়ম-নীতীশের দলগুলোকে জাতপাতের দল বলে কটাক্ষ করা হয়।

শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, রাজমিস্ত্রী, ছুতোর, কামার, মুচি, মেথর, স্বর্ণকার, কুম্ভকার প্রভৃতি পরিচিতি জন্মভিত্তিক নয়, কর্ম বা পেশা ভিত্তিক। কিন্তু 'ব্রাহ্মণ' পরিচিতি জন্মভিত্তিক হয়ে রয়েছে সেই প্রাচীন যুগ থেকে।

৪. দেবোত্তর সম্পত্তিতে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

ব্রাহ্মণরা এমনই ধূর্ত জাতি যে, দেবতার নাম ভাঙিয়ে জনগণের নিকট থেকে জমি-স্বর্ণমুদ্রা-টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করত এবং এগুলোকে তারা ব্রাহ্মণের সম্পত্তি না বলে দেবোত্তর সম্পত্তি বলত। মন্দিরের জন্য বহু সম্পত্তি নিত ব্রাহ্মণরা। সেগুলো দেবোত্তর সম্পত্তি বলা হত। রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির নামে বহু জমি দেবোত্তর সম্পত্তি নামে দলিল করে দিয়েছিলেন। এই জমির খাজনা দিতে হত না সরকারকে। ব্রাহ্মণরা প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা বা টাকা-পয়সা মন্দিরে গচ্ছিত রাখত, এখনও রাখে। সুলতান মামুদ এ কারণে মন্দির লুণ্ঠন করে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা স্বদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। আজও দক্ষিণ ভারতের বড় বড় মন্দিরে বহু স্বর্ণমুদ্রা দেবোত্তর সম্পত্তি রূপে গচ্ছিত আছে' বহু টাকা-পয়সা মন্দিরে ট্রাস্টির নামে ব্যাঙ্কে রাখা হয়। যেহেতু মন্দিরের নামে একাউন্ট সেহেতু

ট্যাক্স দিতে হয় না। ধর্মের নামে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার রীতি আছে এ দেশে। এই সম্পত্তি ব্রাহ্মণরাই ভোগ করছে। দেশের সাধারণ জনগণ এতই ধর্মভীরু, এতই সহজ-সরল-নির্বোধ বা অশিক্ষিত যে, চোখ বন্ধ করে টাকা বা স্বর্ণমুদ্রা দেয় মন্দিরে। বুদ্ধ বলেছেন, ঈশ্বর নামে পৃথিবীতে কেউ নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মন্দিরে দেবতা নেই, ভজন-পূজন-সাধন-আরাধনা করে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না (ধূলামন্দির)। তবুও রবীন্দ্র বিশেজ্ঞরা পুজো-আচ্চা-ঈশ্বর নিয়েই ব্যস্ত। কুকুরের লেজে ঘি মালিশ করলে কি সোজা হয়?

৫. টোল-চতুষ্পাঠীতে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

বর্ণাশ্রম আইনে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই সংস্কৃত ভাষা বা পুজোর মন্ত্র পড়বার অধিকারী ছিল। এই ভাষা পড়ানো হত টোল-চতুষ্পাঠীতে। চারটি বেদ পড়ানো হত, তাই বলা হত চতুষ্পাঠী। বিনয় ঘোষ রচিত 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালীসমাজ' (প্রকাশক ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ১৭ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কল-৭২) গ্রন্থে বলা হয়েছে— 'দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তানরা বাল্যকালে তখন সংস্কৃত শিক্ষা করতেন এবং পরিণত বয়সে কুলপুরোহিত বা সভাপণ্ডিতের কাজ করতেন অথবা অনেকে স্বাধীনভাবে চতুষ্পাঠী খুলে অধ্যাপনা করে কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করতেন। সেইজন্য তাঁদের রাজভাষা (ফারসী/ইংরাজী) শিক্ষার প্রয়োজন হত না।'

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বিদ্যাসাগর) দরিদ্র হলেও বাল্যকালে এসব টোল চতুষ্পাঠীতে পড়াশুনো করতেন। ব্রাহ্মণরা উঁচুজাত হওয়ার কারণে সংস্কৃত পড়তে পারতেন। বিপরীতে শূদ্ররা (SC-ST-OBC) নিচুজাত হওয়ার কারণে চতুষ্পাঠীতে প্রবেশাধিকার পেত না। কায়স্থ বৈদ্যদেরও প্রথম দিকে সংস্কৃত পড়তে দেওয়া হত না। এসব টোল-চতুষ্পাঠীতে উচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রকে বৃত্তি বা স্কলারশিপ দেওয়া হত। বিদ্যাসাগরও বৃত্তি পেতেন। বর্তমানে তফসিলিজাতিকে স্টাইপেন্ড দেওয়া হয় বলে অনেকের গাত্রদাহ আছে। তাঁরা কি ব্রাহ্মণদের স্টাইপেন্ড ব্যবস্থার খবর রাখেন?

৬. উপাধি প্রাপ্তিতে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

টোল-চতুষ্পাঠী বা সংস্কৃতমাধ্যম বিদ্যালয়ে একমাত্র ব্রাহ্মণবংশীয় ছাত্ররাই পড়বার অধিকারী ছিল। কায়স্থ-বৈদ্য-এসসি-এসটি-ওবিসি বা যে কোনো জাতের মেয়েদের এ অধিকার ছিল না। এসব সংস্কৃত মাধ্যম বিদ্যালয়ে মেধাবান ব্রাহ্মণ ছাত্রকে উপাধি দেওয়া হত। এই উপাধি গ্রহণে ছাত্রের স্বাধীনতা ছিল। উপাধিপ্রাপ্ত ছাত্রকে বলা হত সে কোন উপাধি নেবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আজ 'বিদ্যাসাগর' নামেই বেশি পরিচিত। তিনি সংস্কৃত বিদ্যালয় থেকেই 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়েছিলেন। বিদ্যালয় কর্তপক্ষ তাঁকে তিন-চারটি উপাধির তালিকা দিয়েছিল। যে কোনো একটি পছন্দ করতে হবে। ঈশ্বরচন্দ্র তখন 'বিদ্যাসাগর' উপাধিটি পছন্দ করে নিজের নামের সঙ্গে যুক্ত করেন। তেমনি শিবনাথ ভট্টাচার্য ও হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য হয়ে গেলেন শিবনাথ শাস্ত্রী ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এভাবেই সে কালের ব্রাহ্মণ ছাত্ররা তর্করত্ন, বিদ্যানিধি, ন্যায়াধীশ, তর্কালংকার, বিদ্যালংকার, আগমবাগীশ, তর্কসিদ্ধান্ত, তর্কবাগীশ, তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি উপাধী স্বেচ্ছাকৃতভাবে ধারণ করত। কোনো কায়স্থ-বৈদ্য-এসসি-এসটি ওবিসিবর্গের ছাত্ররা এ ধরনের উপাধি ধারণ করার সুযোগই পায়নি। একইভাবে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম কোনো নারীর কিন্তু এ ধরনের উপাধি নেই। উপাধী গ্রহণে শুধু সংরক্ষণ ছিল ব্রাহ্মণ ছাত্রদের।

বলা বাহুল্য, কবিগুরু বা বিশ্বকবি (বরীন্দ্রনাথ), নেতাজী (সুভাষচন্দ্র), মহাত্মা (গান্ধি), বাবাসাহেব (আম্বেদকর), দেশপ্রাণ (বীরেন্দ্রনাথ শাসমল), মাস্টারদা (সূর্য সেন), মহাপ্রাণ (যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল) প্রভৃতি উপাধি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়া হয়নি, স্বেচ্ছায় এঁরা ধারণও করেননি। এগুলো ছিল জনগণের ভালোবাসা, জনগণ প্রদত্ত উপাধি।

৭. পুরোহিততন্ত্রে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

যে কোনো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে একজন সভাপতি বা পরিচালক লাগে। তিনিই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি তাঁর নির্দেশেই চলে। এই পরিচালনার বিনিময়ে তিনি যেমন শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়ে থাকেন তেমনি অর্থও

পেয়ে থাকেন। ধূর্ত ব্রাহ্মণজাতি এই অনুষ্ঠান পরিচালনার সভাপতি পদটি নিজেদের জন্য সংরক্ষিত করে নিয়েছে। 'বেটা সাধুবেশে পাকাচোর অতিশয়'। সাধারণ মানুষ যাতে ব্রাহ্মণদের এই চুরি-বৃত্তি বুঝতে না পারে সেজন্য তারা ধর্ম ও ভগবানের নাম ভাঙাচ্ছে এবং 'পুরোহিত' নামে নিজেদের চিহ্নিত করেছে। 'পুরঃ' কথার অর্থ অগ্র এবং 'হিত' অর্থ মঙ্গল। অর্থাৎ অগ্রে হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি। সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মণদের এই চালাকি বুঝতে পারলো না। পুজো-বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি কর্মে ব্রাহ্মণরা পৌরোহিত্যের দায়িত্ব নিল। বিনিময়ে বিপুল পরিমাণে চাল-কলা-দান-দক্ষিণা-প্রণামী-ইষ্টভৃতি রোজগারের ব্যবস্থাও করলো। ব্রাহ্মণরা রোদ-বৃষ্টিতে দৈহিক পরিশ্রম করবে না বলে একাধিক দেব-দেবীর এবং কয়েক লক্ষ মন্দির তৈরি করলো। পুরোহিততন্ত্রে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ থাকবার জন্য অন্যরা, বিশেষ করে তফসিলিরা (SC-ST-OBC) সেখানে সুযোগই পায় না। রানি রাসমণির দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে মন্ত্রজ্ঞানহীন গদাধর চট্টোপাধ্যায় (রামকৃষ্ণ) পূজারি হয়েছিলেন ব্রাহ্মণজাতির কোটায়। তিনি ব্রাহ্মণ বংশীয় এবং পদবী 'চট্টোপাধ্যায়'। এটাই ব্রাহ্মণের সংরক্ষণ। মণ্ডল, নস্কর, সরদার, মিস্ত্রী, গায়েন, বিশ্বাস পদবীধারীদের জন্য এই সংরক্ষণ নেই। এমনকি কায়স্থ নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ) একজন হিন্দু ধর্মের প্রচারক হয়েও পৌরোহিত্যের অধিকার পাননি। ২০০২ সালে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করেছে, 'অ-ব্রাহ্মণরাও পূজারি হতে পারবে।' কোর্টের এই নির্দেশ কাগজে-কলমেই রয়ে গেছে। কারণ জনগণের মন জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণজাতির প্রতি দুর্বল। কোর্টের নির্দেশ দ্বারা মানুষের মনের এই দুর্বলতা কাটানো যাবে না। সেজন্য চাই বৈজ্ঞানিক আন্দোলন। চাই ব্রাহ্মণদের জালিয়াতি রহস্যের উন্মোচন। ব্রাহ্মণরা কিন্তু অতি সহজে তাদের এই সংরক্ষণনীতি ধ্বংস করতে চাইবে না। কারণ, এই পৌরোহিত্য প্রথার মাধ্যমে তারা একদিকে বিপুল পরিমাণে টাকা পয়সা জিনিসপত্র হাতিয়ে নিচ্ছে, অন্যদিকে সমাজের উপর মাতব্বরি ফলাচ্ছে। সমাজের শ্রদ্ধা ভক্তি অর্জন করছে। ধর্মীয় জগতে তাদের পৌরোহিত্য প্রথা থাকবার জন্যই তারা ডান-বাম রাজনীতিতে নেতা মাতব্বরের পদ পেয়ে যাচ্ছে অনায়াসে। ব্রাহ্মণরা সাধারণ মানুষের রক্ত শোষণ করলেও সাধারণ মানুষ তাদেরকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির চোখেই দেখে। ধূর্ত ব্রাহ্মণজাতি তাই পুরোহিত তন্ত্রের সংরক্ষণ নিজেদের হাতছাড়া করবে না। ব্রিটিশ আমলে বৈদ্যজাতির একাংশ (বৈদ্যরাও শূদ্রজাতি) ঢাকার রাজা রাজবল্লভের (১৬৯৮-১৭৬৩ খ্রিঃ) নেতৃত্বে পৈতে উপবীত ধারণ করে 'ব্রাহ্মণ' হতে চেয়েছিল। ব্রাহ্মণরা বৈদ্যদের এ দাবি মানেনি। ২০০২ সালে সুপ্রীমকোর্ট

অব্রাহ্মণদের পূজারি হওয়ার অধিকার দিলে তার বিরুদ্ধে কোর্টে এবং প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঁচহাজার ব্রাহ্মণ পুরোহিতের স্বাক্ষর করা একটি দরখাস্ত দেওয়া হয়েছিল। এহেন পুরোহিততন্ত্র বা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ধ্বংস করার একমাত্র উপায় ব্রাহ্মণ-বর্জিত আচার-অনুষ্ঠান পালন ও বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ।

৮. পৈতে-উপবীত ধারণে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

হিন্দু ধর্মের মূল সংবিধান (Text) মনুসংহিতা। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে, একমাত্র ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য—এই তিন আর্য বর্ণের পুরুষ পৈতে-উপবীত ধারণ করার অধিকারী। ব্রাহ্মণবংশের নারীরাও এ অধিকার পাবে না, শূদ্ররাও (SC-ST-OBC) এ অধিকার পাবে না। হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়েছে নারীর ঔরসে পুরুষ সন্তানের জন্ম হলে সে 'শূদ্র' হয়েই জন্মায়। তাই ব্রাহ্মণবংশের পুত্রকে পৈতে-উপবীত দিয়ে দ্বিজ বা দ্বিতীয় জন্ম দেওয়া হয়। প্রথম জন্মটি নারীর গর্ভে হওয়ার জন্য পুত্রসন্তান অশুদ্ধ থাকে। তাই পৈতে ধারণের মাধ্যমে তার শুদ্ধিকরণ হয়। মনু সংহিতায় বলা হয়েছে ব্রাহ্মণপুত্রের পৈতে হবে আট থেকে ষোল বছরের মধ্যে, ক্ষত্রিয়ের পৈতে এগারো থেকে বাইশ বছরের মধ্যে এবং বৈশ্যের পৈতে বারো থেকে চব্বিশ বছরের মধ্যে (দ্রঃ মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায় ৩৬-৩৭-৩৮ শ্লোক)।

শুধু তাই নয়, আরো বলা হল—ব্রাহ্মণের পৈতে হবে কার্পাস তুলো দ্বারা নির্মিত, ক্ষত্রিয়ের পৈতে পাটতন্তু দ্বারা এবং বৈশ্যের পৈতে ভেড়ার লোমদ্বারা (দ্রঃ মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়, ৪৪ সংখ্যক শ্লোক)। কাজেই, ব্রাহ্মণ পুত্রের পৈতে ধারণের অর্থ ব-কলমে কাস্ট-সার্টিফিকেট প্রদান। জীবনে কোনো কিছু না করতে পারুক, পৌরোহিত্য করে ব্রাহ্মণদের সংসার চলে যাবে। লেখাপড়া না শিখেও ব্রাহ্মণ হওয়ার দৌলতে ব্রাহ্মণরা পৌরোহিত্য করছে ওঁ-বং-চং দ্বারা। সাধারণ মানুষ এতই নির্বোধ যে, ব্রাহ্মণদের এই মন্ত্রতন্ত্র নিয়ে মাথা ঘামায় না। কারণ, তারা মনে করে ব্রাহ্মণের ভুল ধরলে ভগবান রুষ্ট হয়ে অভিশাপ দেবে। তফসিলিবসর্গের পৌণ্ড্র-রাজবংশী-কৈবর্ত-বাগদি-মাহিষ্যরা পৈতে ধারণ করলেও

তারা কখনোই ব্রাহ্মণের সমতুল মর্যাদা পায় না, পৌরোহিত্যের অধিকার পায় না। হিন্দুশাস্ত্রে তফসিলিদের (SC-ST-OBC) পৈতে ধারণের অধিকার দেওয়া হয়নি। তফসিলিরা যেভাবে পৈতে ধারণ করছে তা পুরোপুরি হিন্দু ধর্মবিরোধী কাজ এবং ব্রাহ্মণরা এদের পৈতেধারণকে পাত্তাই দেয় না। শূদ্র পৈতে ধারণ করলে তার মৃত্যুদণ্ড হবে (দ্রঃ মনুসংহিতা ৯/২২৪)।

৯. শিক্ষার্জনে ব্রাহ্মণ সহ উঁচুজাতদের সংরক্ষণ

আর্যগোষ্ঠীর তিন বর্ণ—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য। এদের পুরুষরা শিক্ষা লাভের অধিকারী, নারীরা নয়। শূদ্রবর্ণের পুরুষ বা নারী কেউই শিক্ষার্জনের অধিকার পাবে না—এটাই হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশ। ব্রাহ্মণ বংশের পুরুষরা পৌরোহিত্যমূলক শিক্ষার্জন করবে, যজন-যাজন-অধ্যাপনার অধিকার পাবে। ক্ষত্রিয়বর্ণের পুরুষরা যুদ্ধ বা রাজ্য পরিচালনার বিষয়ে শিক্ষার্জন করবে। বৈশ্যরা অর্থ নীতি চর্চা করতে পারবে। কিন্তু শূদ্ররা (SC-ST-OBC) শিক্ষার্জনের অধিকার পাবে না। এদের কাজ বিনা মজুরিতে উপরের তিন বর্ণের সেবা করা (দ্রঃ মনুসংহিতার ১ম অধ্যায়ের ৮৮,৮৯,৯০,৯১ শ্লোক, গীতার ১৮অধ্যায়ে ৩৯,৪০,৪১,৪২,৪৩, ৪৪ শ্লোক)। বর্তমান ভারতে তফসিলি সংরক্ষণ এবং মহিলা সংরক্ষণের নেপথ্য কারণ যুগযুগ ধরে শিক্ষা থেকে এদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা। শূদ্রসন্তান শম্বুক গোপনে শিক্ষার্জন করেছিল। এই অপরাধে তাকে খুন করেছিল অযোধ্যার রাজা রাম (দ্রঃ রামায়ণ)। বর্তমান হিন্দুত্ববাদীরা এহেন রামরাজত্ব ফিরিয়ে আনতে চাইছে। শূদ্রসন্তান একলব্য নিজ চেষ্টায় ধনুর্বিদ্যা অর্জন করেছিলেন। অস্ত্রগুরু ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্য সেই অপরাধে তার ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে গুরুদক্ষিণা নিয়েছিল (দ্রঃ মহাভারত)। হিন্দু শাস্ত্রের নির্দেশ আছে—শূদ্র বেদ পাঠ করলে তার জিহ্বা ছেদন করতে হবে, বেদপাঠ শ্রবণ করলে তার কানে তপ্ত তেল ঢেলে দিতে হবে (মনুসংহিতা ৮/২৭২)।

ভারতের ইতিহাস বলছে, বৌদ্ধধর্মের যুগে (মৌর্য রাজত্ব, পালরাজত্ব) শূদ্র তথা নিচুবর্ণের মানুষদের শিক্ষার্জনের অধিকার ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী শুঙ্গ-গুপ্ত-সাতবাহন-সেন প্রভৃতি যুগে সে অধিকার শূদ্রদের ছিল না। ব্রাহ্মণদের সব

যুগেই শিক্ষার্জনের অধিকার ছিল। ব্রিটিশ আমলে সার্বজনীন শিক্ষানীতি চালু হলে শূদ্রদের মধ্যেও শিক্ষার প্রবেশ ঘটে। ব্রাহ্মণরা সে সময় এই সার্বজনীন শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেছিল। রাজা রামমোহন রায়ের (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে বেদপাঠ চলাকালীন শূদ্রের প্রবেশাধিকার ছিল না। এমন কি কায়স্থদেরও ছিল না।

বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত ৩৫ টি বিদ্যালয়ে কোনো শূদ্রকে (SC-ST-OBC) ঢুকতে দেওয়া হত না। এমনকি রামকৃষ্ণ মিশনেও প্রথমদিকে শূদ্র প্রবেশের অধিকার ছিল না। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর কোনো তফসিলি ছাত্রকে প্রবেশের অধিকার দেননি। কায়স্থরা অনেক আবেদন-নিবেদন করে সংস্কৃত কলেজে ঢোকে। আজও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানবিষয়ক পিএইচডি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তফসিলিদের অধিকার দিতে নারাজ ব্রাহ্মণ অধ্যাপকরা। মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে চুনী কোটালের আত্মহত্যা (১৯৯২ খ্রিঃ), হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা (২০১৬ খ্রিঃ) এবং উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলিত ছাত্র-ছাত্রীদের উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন—এসবই শিক্ষার্জনে শূদ্রদের প্রতি বাধাদানের দৃষ্টান্ত। হিন্দুশাস্ত্র মতে শিক্ষা থাকবে বরাবর আর্য তিন বর্ণের জন্য সংরক্ষিত। সেই সংরক্ষণ অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে ব্রাহ্মণরা সদাসচেতন।

১০. পুকুরের পানীয় জলে ব্রাহ্মণের সংরক্ষণ

বর্তমান যুগে পানীয় হিসেবে আমরা মাটির তলার জল এবং পরিশোধন করা গঙ্গার জল বা পাহাড়ের ঝর্ণার জল-বরফগলা জল ব্যবহার করছি। কিন্তু একসময় বড় বড় পুকুর খনন করা হতো, সেই জল খেত মানুষ। ফিটকিরি দিয়ে বা থিতিয়ে অথবা ফুটিয়ে পুকুরের জল পান করত মানুষ। ঘটনা হলো—এই পুকুরের জল নিতে পারতো না তফসিলিরা (শূদ্ররা)। এইসব পুকুরের জল শুধু সংরক্ষণ ছিল ব্রাহ্মণ সহ উঁচুজাতদের। পুকুরের জল শূদ্র স্পর্শ করলে অশুদ্ধ হয়ে যাবে, তাই শূদ্রদের খেতে হত খাল-বিল-ডোবার জল। ১৯২৭ সালে মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত দিঘি চৌদার জল শূদ্রদের জন্য উন্মুক্ত করার জন্য আন্দোলন করেছিলেন আম্বেদকর। ওই পুকুর ছিল ব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষিত।

১১. ধন-সম্পত্তিতে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র মনুসংহিতার বক্তব্য—পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। ব্রাহ্মণ উঁচুবর্ণ ও শ্রেষ্ঠবর্ণ হওয়ার দৌলতে পৃথিবীর যাবতীয় ধন-সম্পত্তি ব্রাহ্মণের উপভোগ্য—সর্বং স্বং ব্রাহ্মণেস্যেদ্যং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্। শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্বং বৈ ব্রাহ্মণোহর্হতি (১/১০০)।। ভারতের ভৌগোলিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ব্রাহ্মণরা কখনো নিজেরাই জমির মালিক, কখনো অন্যকে প্রজা সাজিয়ে সেই মালিকানা নিজেদের হস্তাত রেখেছে। কোনো ব্রাহ্মণ ব্যক্তি দা-কুড়ুল-কোদাল-লাঙল-কাস্তে হাতে করে জঙ্গল কেটে, আবাদ করে, ফসল উৎপাদন করেনি। অথচ কাগজে কলমে সরকারিভাবে তারাই মালিক (Land Lord) । কবি নজরুল ইসলাম তাই বলেছেন, 'মাটিতে যাদের পড়ে না চরণ, মাটির মালিক তাহারাই হন।' ঘটনা হল দৈহিক শ্রমের দ্বারা সমস্ত জমি চাষযোগ্য করেছে শূদ্র তথা তফসিলি বর্গের (SC-ST-OBC) লোকেরা। অথচ তারা মালিক নয়। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তৈরি করে ব্রিটিশ সরকার এই ব্রাহ্মণ জমিদারদের জমিদারী প্রথা পাকাপোক্ত করে দেয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) জমিদারত্ব থেকে পশ্চিমবঙ্গের (কলকাতা) ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা কেড়ে নিতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন জমিদাররাও বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে ব্রাহ্মণ জমিদারদের জমিদারত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার আন্দোলন করেছিলেন। মনুসংহিতায় রয়েছে, শূদ্রের ধনসঞ্চয়ের অধিকার থাকবে না। কারণ শূদ্রের ধন হলে ব্রাহ্মণকে মানবে না (১০/১২৯)। শূদ্ররা ব্রাহ্মণের এঁটো খাবার, পরিত্যক্ত ছেঁড়া বস্ত্র, পরিত্যক্ত গৃহ প্রভৃতি নিয়ে বসবাস করবে (১০/১২৫)। ধূর্ত ব্রাহ্মণজাতি ধর্ম আর ভগবানের নাম ভাঙিয়ে শূদ্রের উৎপাদিত দ্রব্যাদি হাতিয়ে নেওয়ার ধান্দা করল এবং বলল—সেবা করা মহৎ কাজ, ব্রাহ্মণকে দান করা মহৎ কাজ। শূদ্রের উদ্দেশে বলা হল—উপরের তিনবর্ণের (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য) সেবা করা শূদ্রের কাজ (দ্রঃ মনুসংহিতা ১০/১২৩, গীতা ১৮/৪৪)। ব্রাহ্মণরা আজও ধর্মের নামে, ভগবানের নামে, সংগঠনের নামে এবং রাজনীতির নামে উৎপাদক শ্রমজীবী শূদ্রশ্রেণির (SC-ST-OBC) ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করে চলেছে। বিশেষ করে রাজক্ষমতায় থাকার দৌলতে তারা সুবিপুল পরিমাণে রাজস্ব ভোগ করছে, সরকারি চাকরি ভোগ করছে, ধর্মের নামে চাল-কলা-দান-দক্ষিণা-ইষ্টভৃতি তো আছেই।

১২. পথ চলায় ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

ভারতবর্ষে এমন একটা সময় ছিল যখন তফসিলিবর্গের (SC-ST-OBC) মানুষদের দেহ স্পর্শ দূরের কথা, ছায়াও পর্যন্ত স্পর্শ করত না ব্রাহ্মণরা। কোনো তফসিলি ব্যক্তি যদি (শূদ্র) ব্রাহ্মণের দেহ স্পর্শ করত তাহলে তার উপর নেমে আসতো কঠোর শাস্তি। মৃত্যু দণ্ডও দেওয়া হত। ব্রাহ্মণরা গঙ্গাজলে স্নান করে শুদ্ধ হত। শূদ্রের (SC-ST-OBC) ছায়া মাড়ালেও গঙ্গাজলে শুদ্ধ হতে হত ব্রাহ্মণদের। এহেন পরিস্থিতিতে সকালে বা বিকালে প্রধান প্রধান রাস্তায় হাঁটা নিষেধ ছিল তফসিলিদের। পথ চলাতেও ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ ছিল। সকালে ও বিকালে দেহের ছায়া লম্বা হয়। শূদ্রের ছায়াতেও রাস্তা অপবিত্র হয়ে যেত। তাই সকাল-বিকেল রাস্তায় হাঁটা বারণ ছিল শূদ্রদের। দুপুরে যখন ছায়া থাকত পায়ের তলায় তখন রাস্তায় বের হত শূদ্ররা। তখনও গলায় মাটির পাত্র থাকতো থুতু ফেলবার জন্য এবং কোমরের পিছনে ঝাঁটা থাকতো পায়ের ধুলো ঝাঁটানোর জন্য।

ব্রাহ্মণজাতি এতটাই ভয়ঙ্কর যে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম যেদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পা দিয়েছিলেন সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কলসিকলসি গঙ্গাজল দ্বারা মন্দির ধুয়েছিল। কারণ বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) জাতিতে শূদ্র (কায়স্থ)। স্বাধীনভারতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগজীবন রাম একটি মূর্ত্তি উদ্বোধন করেছিলেন। ব্রাহ্মণরা পরে সেই মূর্ত্তিটি গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়েছিল। কারণ, জগজীবন ছিলেন শূদ্র মুচির সন্তান।

১৩. 'দান' গ্রহণে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

ধূর্ত ব্রাহ্মণজাতি কৃষিকাজ, ছুতোর-কামার-কুমোর-মৎস্য ধরা প্রভৃতি কঠোর কাজ করবে না বলে উঁচুজাত সেজেছে, নিজেদের 'ব্রাহ্মণ' বলে ঘোষণা করেছে এবং নিজেদের জীবন ধারণের জন্য ধর্ম ও ভগবানের নাম ভাঙিয়ে লোকের নিকট থেকে টাকা-পয়সা-জিনিস-পত্র হাতিয়ে নেওয়ার ধান্দা করেছে। এই

ধান্দাবাজিকে তারা দান-দক্ষিণা-প্রণামী-ইষ্টভৃতি প্রভৃতি শব্দ-ভাষায় আখ্যায়িত করেছে, জনগণ যাতে তাদের ধান্দাবাজি বুঝতে না পারে। তারা প্রচার করেছে দান করা মহৎ কাজ, দান করা দেবধর্ম, দান করা শ্রেষ্ঠকাজ, পুণ্যকর্ম। সাধারণ জনগণ ব্রাহ্মণদের এই ধান্দাবাজি ও শঠতা বুঝতে পারেনি এবং আজও বুঝতে পারে না। কারণ এই ধান্দাবাজির সাথে ভগবান, ধর্ম, স্বর্গ, পাপ-পুণ্য ইত্যাদি বিষয়গুলো জড়িয়ে দিয়েছে। সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে আজ প্রশ্ন তোলা উচিত, দান করা যদি মহৎ কাজ ও পুণ্যকাজ হয় তাহলে তোমরা (ব্রাহ্মণরা) কেন জনগণকে এগুলো দান করে মহৎ হতে চাইছো না? জনগণের মনে প্রশ্ন ওঠা উচিত, কৃষক - কামার-কুমোর প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষেরা ব্রাহ্মণদের দান করেও আজ আর্থ-সামাজিকভাবে তারা এতো নিচে রয়েছে কেন? ব্রাহ্মণরা কেন এই মহৎ লোকদের (শ্রমিক) শূদ্র-নিচুজাত বলে ঘৃণা-অবজ্ঞা করে থাকে? ঘটনা হল, যুগযুগ ধরে যারা ব্রাহ্মণকে দান করলো আজ তারাই হয়ে গেল তফসিলি জাতি (SC-ST-OBC)। আর যারা এদের দান গ্রহণ করলো তারা অনেক উপরে উঠে গেল। অতএব, দানের রহস্য উদ্ধার করা দরকার।

হিন্দু ধর্মে শ্রাদ্ধকার্যে দানসাগর বিধি আছে (দ্রঃ পুরোহিত দর্পণ)। দ্বাদশদান বা ষোড়শদানের কথা উল্লেখ আছে বায়ুপুরাণে। পায়ের জুতো থেকে মাথার ছাতা, সবই দান করতে হয় ব্রাহ্মণকে। সমস্ত জিনিস দান করার সময় 'ব্রাহ্মণেভ্য নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় প্রয়াত ব্যক্তির পুত্রকে। দান সম্পর্কে ব্রাহ্মণদের বক্তব্য—প্রয়াত ব্যক্তির আত্মা স্বর্গে যাবে বা স্বর্গে চলে গেছে। তার ব্যবহারের জন্য জিনিসপত্র দিতে হবে। সব জিনিস ব্রাহ্মণ পুরোহিতই পৌঁছে দেবে প্রয়াত ব্যক্তির আত্মার কাছে। হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করলে দাতার স্বর্গলাভ হয়, গাভী দান করলে দাতা বৈতরণী পার হয়ে যায়, বাড়ি দান করলে পরলোকে অট্টালিকার অধিকারী হওয়া যায়, ছাতা দান করলে কঠোর রোদ-বৃষ্টি থেকে ত্রাণ পায় দাতা। ব্রাহ্মণ-ভোজনে পুণ্য কর্ম হয়। এভাবে বহু জিনিস দান করলে নাকি পৃথক পৃথক ফল লাভ হয় দাতার। ষোড়শ দানের তালিকায় রয়েছে—জুতো, ছাতা, বিছানা-মশারি-বালিশ-বেডশিট, পিতল-কাঁসা-হাতা-খুন্তি-হাঁড়ি-থালা, ধুপ-ধুনো-আতর সেন্ট গন্ধদ্রব্য, গাভী, জমি, সোনা, কাপড়-গামছা, চাল-পাকাকলা-কাঁচা তরকারি, পান-সুপারি নেশার দ্রব্য, খাট, বসার আসন, মাদুর ইত্যাদি। বায়ুপুরাণে রয়েছে প্রতিটি দ্রব্য ১৬টি করে দিতে হবে। অর্থাৎ ষোড়শদানে ১৬ X ১৬ = ২৫৬ টি জিনিস পাবে ব্রাহ্মণ।

এ কালের ব্রাহ্মণরা ষষ্ঠীপুজোর ফর্দে বেবি জংশনের পাউডার-সাবান, শাড়ী, বাচ্চার পোশাক প্রভৃতি লিখছে। হয়ত আগামী দিনে লিখবে—টিভি, ফ্রিজ, ফ্যান, লাইট, ওয়াশিং মেশিন, এয়ার কন্ডিশন মেশিন, ফোন, ল্যাপটপ, গিজার ইত্যাদি। শ্রাদ্ধের সময় ব্রাহ্মণরা বলে থাকে, তোমার বাবা যা যা ব্যবহার করত সবই দিতে হবে। অতএব, টিভি-ফ্রিজের নামও ফর্দে আসতে আর দেরি নেই। কারণ, এখনকার সচ্ছল পরিবার তো এগুলো ব্যবহারই করে।

ব্রাহ্মণকে দান করা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন হলো—বিয়েতে কন্যাপক্ষ কিছু জিনিসপত্র দান করে মেয়ে-জামাইকে। সেই জিনিস সব নিয়ে যায় মেয়ে-জামাই। ব্রাহ্মণ সেই জিনিস পায় না, তার আলাদা পারিশ্রমিক আছে। তাহলে শ্রাদ্ধের সময় প্রয়াত পিতা-মাতার উদ্দেশে প্রদত্ত জিনিসপত্র ব্রাহ্মণ নেবে কেন? সেগুলো পিতা-মাতার স্মৃতিতে তার পুত্রের কাছেই সংরক্ষিত থাকা উচিত। অথচ, ব্রাহ্মণ কী করছে? প্রয়াত ব্যক্তির নামে উৎসর্গীকৃত জিনিসপত্র হাতিয়ে নিচ্ছে। নির্বোধ মানুষেরাও কোনো প্রশ্ন তুলছে না।

১৪. ভোজনে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

হিন্দু ধর্ম শাস্ত্র মনুসংহিতায় (৩/১১০) রয়েছে—ব্রাহ্মণের গৃহে ক্ষত্রিয় - বৈশ্য-শূদ্ররা অতিথি হিসেবে গণ্য হবে না। কিন্তু ব্রাহ্মণকে সবাই ভোজন দেবে। দৈব ও পিতৃকার্যে ব্রাহ্মণ ভোজন উচিত (মনুসংহিতা, ৩/১২৯)। শ্রাদ্ধকর্ম উপস্থিত হলে পূর্বদিনে বা শ্রাদ্ধদিনে কমপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণকে ভোজন দিতে হবে (মনুসংহিতা, ৩/১৮৭)। হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণকে দেবতার অংশ বলা হয়। ব্রাহ্মণ-ভোজনে দেবতারা সন্তুষ্ট হয় বলে ধারণা। দৈবকার্য হল দেব-দেবীর পুজো এবং পিতৃকার্য হল প্রয়াত পিতা বা গুরুজনদের শ্রাদ্ধ। এসব কাজে ব্রাহ্মণকে শুধু প্রণামী, দান-দক্ষিণা দিলেই হবে না, দিতে হবে ভোজনও। কিন্তু ব্রাহ্মণরা শূদ্রের (SC-ST-OBC) বাড়িতে রন্ধনজাত খাদ্য খেতে পারবে না, এটাই হিন্দুশাস্ত্র মনুসংহিতার নির্দেশ—শূদ্রান্ন ব্রহ্মতেজ নষ্ট করেঃ শূদ্রান্নং ব্রহ্মবর্চসম

(মনুসংহিতা—৪/২১৮)। ভোজনরত ব্রাহ্মণকে শূদ্ররা দেখবে না, ব্রাহ্মণের খাবার যেন শূদ্র স্পর্শ না করে (মনুসংহিতা—৩/২৩৯, ২৪১)। শূদ্রের রন্ধনজাত খাবার ব্রাহ্মণ গ্রহণ করবে না, বরং অরন্ধন দ্রব্য গ্রহণ করবে—নাদ্যাচ্ছূদ্রস্য পক্কান্নং বিদ্বানশ্রাদ্ধিনো দ্বিজঃ। আদদীতামমেবাস্মাদবৃত্তাবেকরাত্রিকম (মনুসংহিতা৪/২২৩)। ব্রাহ্মণরা যেহেতু শূদ্রের ছোঁয়া খাবে না সেহেতু পুজো-বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি কর্মে ব্রাহ্মণকে আতপচাল ও কাঁচা তরকারি দিতে হয়। অথবা, নিজহাতে রান্না করে ব্রাহ্মণরা খেয়ে থাকে। এবং অবশ্যই শূদ্রের সমাজে বসে সে খাবে না। শূদ্র (SC-ST-OBC) যদি ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসে তাহলে শূদ্রের কোমরে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিতে হবে অথবা নিতম্ব এমনভাবে কেটে দিতে হবে যেন তার মৃত্যু হয় (মনুসংহিতা ৮/২৮১) শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সৎসঙ্গে কোনো ব্রাহ্মণ শিষ্য কোনো তফসিলি শিষ্যের ছোঁয়া খায় না। রামমোহন কখনোই অব্রাহ্মণের ছোঁয়া খাননি। রামকৃষ্ণ অব্রাহ্মণের হাতের ছোঁয়া খেতেন না (দ্রঃ রামকৃষ্ণ কথামৃত)। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব শিষ্যরাও অবৈষ্ণবদের ছোঁয়া খায় না। অথচ এই ভণ্ডরা অব্রাহ্মণ মিষ্টির দোকানদারের হাতে তৈরি রসগোল্লা-জিলাপি গোগ্রাসে খায়। এই ধর্মীয় গোঁড়ারা এমনই নিরেট ও নির্বোধ যে, ভাত-তরকারির ন্যায় রসগোল্লা-জিলাপি-চানাচুর-বিস্কুট এবং হাজারো খাবার, বিশেষ করে ঔষধপত্র সবই রন্ধন বা আগুনে সিদ্ধ করে প্রস্তুত করা হয়। ধর্মই মানুষকে সংকীর্ণ ও কুয়োর ব্যাঙ বানিয়ে রেখেছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৫. শাস্তি মুকুবে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

আইন-কানুন ও শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী। ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র একই অপরাধ করলে শূদ্র কঠোর শাস্তি পাবে, এমনকি মৃত্যুদণ্ডও পেতে পারে। কিন্তু সেই অপরাধে ব্রাহ্মণ শাস্তি পাবে না বা কম শাস্তি পাবে (দ্রঃ মনুসংহিতা ঃ ৮/৩৬৬, ৮/৩৮৫, ৮/২৭০, ৮/২৬৮, ১১/৬৬)। শূদ্রহত্যাকে গোধা, পেচক, বেজি, বিড়াল, কুকুর, কাক বধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (১১/১৩১)। শূদ্র হত্যায় কোনো পাপ নেই, ব্রহ্মহত্যা ভয়ঙ্কর পাপ।

ব্রাহ্মণরা যুগযুগ ধরে এধরনের সুবিধা ভোগ করে আসছে। ব্রিটিশ আমল থেকে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে। ব্রিটিশ সরকার বহু ব্রাহ্মণকে শাস্তি দিয়েছে। তবে রাজনীতিতে আজও ব্রাহ্মণ নেতাদের অপরাধ ধর্তব্য হয় না, তফসিলি নেতাদের অপরাধে সংবাদপত্রে ঢিঢি পড়ে যায়। অফিসেও ব্রাহ্মণ কর্মচারির ভুল বা অপরাধকে ধরা হয় না, তফসিলিদের বেলায় ঢাক পেটানো হয়। ব্রাহ্মণ কর্মচারিরা ভুল করলে বলা হয়—মানুষ মাত্রই ভুল হয়। কিন্তু এসসি. এসটিরা ভুল করলে বলা হয়—সংরক্ষণের চাকরি তো, তাই ভুল করছে।

১৬. ব্রাহ্মধর্মে ব্রাহ্মণ সহ উঁচুজাতদের সংরক্ষণ

রাজা রামমোহন রায় (বন্দ্যোপাধ্যায়) ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসভা ও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে এর নাম পাল্টে রাখা হয় ব্রাহ্মধর্ম। রামমোহন থেকে দেবেন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীকালে ব্রাহ্মধর্মে দেখা গেছে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য—এই তিন বর্গের মানুষেরাই শিষ্যত্ব নিতে পেরেছিল। এদের নিচে অবস্থিত গরীব ও শূদ্রদের (SC-ST-OBC) ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা দেওয়া হত না। ঊনিশশতকে ব্রাহ্মসভা-ব্রাহ্মসমাজ-ব্রাহ্মধর্ম ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে যে নবজাগরণ আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তা সীমাবদ্ধ ছিল ধনী অভিজাত ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যদের মধ্যে। এই আন্দোলনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি গরীব ও তফসিলিদের (SC-ST-OBC)। এহেন ব্রাহ্মধর্মের নেতারা আবার দাবি করতেন তাঁরা নাকি যুক্তিবাদী, সমাজদরদী ও কুসংস্কারমুক্ত। বাস্তবে তাঁরা সবাই ঘোরতর ব্রাহ্মণ্যবাদী, সংকীর্ণচেতা, তফসিলি বিদ্বেষী এবং অনুদার। তাঁরা স্বজাতিসমাজের জাগরণ বা উন্নতির স্বার্থে আন্দোলন করেছিলেন। নিচের তলার মানুষদের প্রতি তাঁদের কোনো দায়বদ্ধতাই ছিল না। রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দরা কুসংস্কারমুক্ত বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানী ও সচেতন ছিলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই ব্রাহ্মণ্যবাদী বৈদিক তথা অধুনা কথিত হিন্দু ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। তাঁরা ব্রাহ্মণ্যজাতির স্বার্থেই বৌদ্ধধর্মের

পুনর্জাগরণ আন্দোলন করেননি। বৌদ্ধধর্মের আন্দোলন করলে সমাজে ব্রাহ্মণ্যজাতির আধিপত্য চুরমার হয়ে যাবে। তাঁরা জেনেশুনে কি নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারতে পারেন?

ব্রাহ্মধর্ম আদতে ছিল হিন্দু ধর্মের একটি শাখা। মুসলমান আমলে ইসলামে ধর্মান্তকরণ বন্ধ করার জন্য শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মের নামে হিন্দু অন্দোলন করেছিলেন। তেমনি ব্রিটিশ আমলে খ্রিস্ট ধর্মান্তকরণ রদের জন্য ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন করেন রামমোহন-রবীন্দ্রনাথরা।

১৭. মন্দিরের পূজারি পদে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

ব্রাহ্মণরা ফাঁকি দিয়ে অর্থ রোজগার করবে বলে তেত্রিশ কোটি দেবতার জন্ম দিয়েছে। লাখোলাখো মন্দির তৈরি করেছে যা তৈরি করতে নির্বোধ তফসিলিদের উৎসাহ যুগিয়ে চলেছে। রাস্তাঘাটে, বাজারে, প্লাটফর্মে, বাস ও রিকসাস্ট্যান্ডে, খেয়াঘাটে, বটতলায়, পাহাড়-পর্বতের গাঁটেগাঁটে, সমুদ্রের মাঝখানেও শনি-শীতলা-দুর্গা-লক্ষ্মী-সরস্বতী-জগদম্বা-ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর - নারায়ণ কাত্যায়নী-কালী-রক্ষাকালী-ডাকাতে কালী-হাজারে কালী ইত্যাদি দেব-দেবীর জন্ম দেওয়া হয়েছে, যাদের পিতা-মাতার ঠিক নেই। সমস্ত মন্দিরে সংরক্ষণের কোটায় ব্রাহ্মণরাই পূজারি হচ্ছে। রানি রাসমণির মন্দিরেও সংরক্ষণের কোটায় রামকুমার চট্টোপাধ্যায় বা তাঁর ছোট ভাই গদাধর চট্টোপাধ্যায় (রামকৃষ্ণ) পূজারিবৃত্তি নিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ আবার ডাই-ইন-হারনেস কেসে পূজারি হয়েছিলেন। বড়দার (রামকুমার) মৃত্যুতে তাঁকে পূজারি করা হয়েছিল। হিন্দুশাস্ত্র মতে শূদ্র তথা তফসিলিদের পৌরোহিত্য করবার অধিকার নেই।

১৮. পদবী প্রথায় ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

ধর্ম, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়গুলি মানুষের জীবনে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। এদের মধ্যে একমাত্র ধর্মই মানুষে-মানুষে উঁচু-নিচু সম্প্রদায় বা জাতিভেদ প্রথার জন্ম দিয়েছে। যে ধর্মকে মানুষ সত্য, সুন্দর, শান্তির আশ্রয় রূপে মনে করে, বাস্তবে সেই ধর্মই মানুষে মানুষে সম্প্রদায়গত বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। স্বঘোষিত ধার্মিক মানুষেরা অত্যন্ত সংকীর্ণ, দুর্বলচেতা, সাম্প্রদায়িক ও শুচিবাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ধর্ম ও জাতিগত হিংসা রাজনৈতিক হিংসার চেয়ে মারাত্মক। রাজনৈতিক গণ্ডগোল নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে আটকে থাকে, ধর্ম ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ কোনো সীমার মধ্যে আটকে থাকে না। ধর্মভিত্তিক সমাজে জাতিভেদ প্রথা এক বিষময় ফল। পদবী কোনো জাতির নিজস্ব সম্পত্তি নয়। অথচ, সমাজে জাতব্যবস্থা থাকবার কারণে পদবীগুলোও জাতিভেদে চিহ্নিত হয়ে গেছে। এর ফলে কোনো কোনো পদবী উঁচু তকমা এবং কোনো কোনো পদবী নিচু তকমা পেয়ে গেছে। চক্রবর্তী, বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য, সান্যাল, লাহিড়ী, কর, ধর, ঘটক, পূততুণ্ড, ঘোষাল, মৈত্র, রায়চৌধুরী প্রভৃতি পদবী ব্রাহ্মণ জাতির জন্য সংরক্ষিত হয়ে গেছে। কায়স্থদের মধ্যে ঘোষ-বোস-গুহ-মিত্র-দে-মজুমদার- দত্ত-চৌধুরী; বৈদ্যদের মধ্যে সেন, সেনগুপ্ত, গুপ্ত, দাশ, দাশগুপ্ত, দেখা যায়। রায়, মজুমদার, চৌধুরী কিছু পদবী সকলের মধ্যে দেখা যায়। হিন্দুসমাজে শূদ্রদের (SC-ST-OBC) মধ্যে দেখা যায়—মণ্ডল, সরদার, নস্কর, মিস্ত্রী, ঘরামি, গায়েন, বিশ্বাস, হালদার, বায়েন প্রভৃতি পদবী। ব্রাহ্মণ সহ উঁচুজাতের লোকেরা নিম্নোক্ত পদবীগুলোকে ঘৃণার চোখে দেখে। তফসিলিরা ব্রাহ্মণদের ঘৃণা অপমান থেকে বাঁচার জন্য অনেক সময় রায়, মিত্র, মজুমদার, সরকার প্রভৃতি পদবী ধারণ করছে। এগুলো মূলত কায়স্থ-বৈদ্যদের পদবী। ঘটনা হল, কেউই চক্রবর্তী-ভট্টাচার্য-মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পদবী ধারণ করতে পারছে না। কারণ, এগুলো ব্রাহ্মণজাতির জন্য সংরক্ষিত হয়ে গেছে। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য জাতি যেমন সম্মানিত জাতি তেমনি তাদের পদবীগুলোও সম্মানিত পদবী। অথচ মানবতা, যুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্কতার দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে হিন্দুসমাজে সম্মানিত জাতিগুলোই অপরাধপ্রবণ ও কুসংস্কারগ্রস্ত জাতি। বিশেষ করে ব্রাহ্মণজাতি অত্যন্ত অপরাধপ্রবণ, কুসংস্কারগ্রস্ত ও

অমানবিক। কারণ বর্ণাশ্রম-জাতিভেদ-ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র-পুরোহিততন্ত্র-যাগযজ্ঞের ছলে অর্থ রোজগার, স্বর্গ-আত্মা-পরজন্ম প্রভৃতি মিথ্যাচার সৃষ্টি, সতীদাহ-বাল্যবিবাহ-বহুবিবাহ-দেবদাসী প্রথা-গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন-শল্যচিকিৎসা নিষিদ্ধকরণ—সমুদ্র পেরিয়ে বিদেশগমন নিষিদ্ধ, মাটির, পুতুলকে 'দেবতা' বানিয়ে অর্থ রোজগার প্রভৃতি হাজারো কুসংস্কার ও অমানবিক জাতব্যবস্থার জনক ব্রাহ্মণজাতি। হিন্দু সমাজে অনৈক্যের প্রধান কারণ ব্রাহ্মণদের সৃষ্ট জাতব্যবস্থা। কায়স্থ-বৈদ্যরা অতীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী থাকলেও বর্তমান তারা অন্ধভাবে ব্রাহ্মণদের সমর্থক। এহেন কুসংস্কারগ্রস্ত-অবৈজ্ঞানিক-অপরাধপ্রবণ ব্রাহ্মণ কায়স্থ-বৈদ্যদের পদবী যারা ধারণ করে 'উঁচুজাত' হতে চাইছে, তফসিলিজাতিতে তারা নির্বোধ ও বর্ণচোরা রূপে চিহ্নিত। এরা যুক্তি ও বিজ্ঞানমনস্কতার উপর দাঁড়িয়ে জাতব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন না করে কাপুরুষোচিতভাবে পদবী পরিবর্তন করছে। অপরাধপ্রবণ ও কলঙ্কিত ব্রাহ্মণ জাতির পদবী নিয়ে প্রকৃত সম্মান অর্জন করা যায় না, বিষয়টি বোঝা দরকার তফসিলিভুক্ত বর্ণচোরাদের।

১৯. ভিক্ষাবৃত্তিতে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

'ব্রাহ্মণ' পরিচয়টা ভিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রেও কাজে লাগানো হচ্ছে। রাস্তা-ঘাটে, ট্রেনে-বাসে, প্লাটফর্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণরা 'ভিক্ষা' বা সাহায্য চাইতে গেলে বলছে—'আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমাকে কিছু দান করবেন? বা আমাকে সাহায্য করবেন? পুত্রসন্তানের পৈতে ধারণের জন্য আয়োজিত যজ্ঞের খরচের জন্যও কেউকেউ অর্থ সাহায্য নেয়। খেয়াল করতে হবে, ব্রাহ্মণরা তাদের জাতের নাম ভাঙাচ্ছে, দ্বিতীয়ত 'ভিক্ষা' শব্দের পরিবর্তে 'দান' বা 'সাহায্য' শব্দ ব্যবহার করছে। সাধারণ মানুষ ব্রাহ্মণদের এই দরিদ্রতা দেখে বড়ই কাতর হয়ে পড়ে এবং যথাসাধ্য সাহায্য করে। যদি কেউ বলত, আমি একজন তফসিলি ব্যক্তি বা একজন মুসলমান ব্যক্তি, একজন আদিবাসী ব্যক্তি তাহলে মানুষের মন তাতে সহানুভূতিশীল হত না। দরিদ্র ব্রাহ্মণরাও জানে, মানুষেরা ব্রাহ্মণজাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দুর্বল। তাই জাতের নাম ভাঙিয়ে তারা 'দান' চায়।

২০. সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

ব্রাহ্মণরা বাঙালী ছিল না, বাঙলা তাদের মাতৃভাষা নয়। বাঙলা ভাষার জনক বৌদ্ধরা। বাংলা সাহিত্যের আদিরূপ 'চর্যাপদ' রচনা করেছেন বৌদ্ধ কবিরা। ব্রাহ্মণদের মাতৃভাষা সংস্কৃত। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণরা উঁচুবর্ণ, তাই তাদের মাতৃভাষা সংস্কৃতভাষা শিক্ষার অধিকার শূদ্র বা অব্রাহ্মণদের ছিল না। ব্রাহ্মণরা সংস্কৃতভাষায় বই বা মন্ত্রতন্ত্র লিখেছে। শূদ্ররা এসব বই পড়লে শিক্ষিত হয়ে যাবে এবং ব্রাহ্মণদের মাতব্বরি মেনে নেবে না। এই ভয়ে শূদ্রদের অস্পৃশ্য করা হয়েছিল বর্ণাশ্রম আইনের দ্বারা। সংস্কৃত ভাষা শূদ্ররা শিখলে নিজেরাই পুজো-আচ্চা করবে—এটা চায় না ব্রাহ্মণরা। তাতে তাদের ব্যবসা মরে যাবে। অন্যদিকে সংস্কৃতভাষায় রচিত বেদ-মনুসংহিতা-গীতা প্রভৃতি গ্রন্থে শূদ্রদের উদ্দেশে অনেক গালাগালি বাচক শব্দ আছে। শূদ্ররা সংস্কৃত শিখলে এসব জেনে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে। এ কারণে, ব্রাহ্মণরা টোলে সংস্কৃত পড়ত, সেখানে শূদ্রের প্রবেশাধিকার ছিল না। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে শুধু ব্রাহ্মণ ছাত্ররাই পড়ত, কায়স্থদেরও প্রবেশাধিকার ছিল না। ১৮৫১ সাল নাগাদ কায়স্থদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। তফসিলিদের সে অধিকার দেওয়া হয়নি। আম্বেদকরকে সংস্কৃত পড়ার জন্য বিদেশে যেতে হয়েছিল। বিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহাকেও সংস্কৃত শিখতে দেওয়া হয়নি। ব্রাহ্মণদের বক্তব্য ছিল সংস্কৃত হল দেবতার ভাষা—দেবভাষা, এই ভাষা অ-ব্রাহ্মণরা উচ্চারণ করলে অপবিত্র হয়ে যাবে। ব্রাহ্মণরা টোল-চতুষ্পাঠী (চারবেদ পাঠ) খুলে স্বজাতিকে শিক্ষিত করত, সংস্কৃত মন্ত্র শিখে অর্থ রোজগার করত। মুসলমান আমলে (১২০০-১৭৫৭ খ্রিঃ) ব্রাহ্মণদের মধ্যে বাঙলা ভাষার প্রচলন হয়। ব্রাহ্মণরা ধীরে ধীরে বাঙালী হতে থাকে।

২১. শ্মশানে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথা এমনই কঠোর যে, মরে যাওয়ার পরেও ব্রাহ্মণদের মৃতদেহ পৃথক শ্মশানে পোড়ানো হত। আজও গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী গ্রামে ব্রাহ্মণ ও তফসিলি জাতির জন্য পৃথক পৃথক শ্মশান বিদ্যমান। শহর বা

শহরতলীর ইলেকট্রিক চুল্লিতে ব্রাহ্মণদের মরদেহ দেওয়ার আগে গঙ্গাজল দ্বারা ওই চুল্লির শুদ্ধিকরণ হয়। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে দেখা গেছে, ব্রাহ্মণ পত্নীর মৃত্যুতে যে শবযাত্রা শ্মশানের উদ্দেশে বেরিয়েছিল সেই যাত্রায় কোনো শূদ্রের পা মেলানোর অধিকার ছিল না। ব্রাহ্মণের মৃতদেহ কোনো শূদ্র স্পর্শ করতে পারবে না, তাই ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে একটা শ্রেণির উদ্ভব হল যারা মড়াপোড়ানো ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে এই মড়াপোড়ানো ব্রাহ্মণরা তার জাতভাইদের চেয়ে নিচুতে নেমে গেল। অভিজাত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মড়াপোড়ানো ব্রাহ্মণদের পরিবারের বিবাহ-আত্মীয়তা ছিল না। ফলে সমাজে এরা হেয় প্রতিপন্ন হয়। এজন্য ১৯৯০ সালে মণ্ডল কমিশনের প্রস্তাবে এই মড়াপোড়াদের 'ওবিসি' স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। রান্নার কাজেও ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণের ছোঁয়া খায় না। সেহেতু ব্রাহ্মণদের একাংশ রাঁধুনী ব্রাহ্মণ বা ঠাকুর ব্রাহ্মণ রূপে আত্মনিবেশ করে। এরাও বর্তমান ওবিসি (OBC) রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে।

২২. ছাত্র-বৃত্তি প্রাপ্তিতে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

বর্তমান ভারতের সংবিধানে শূদ্র তথা তফসিলিজাতিকে (SC-ST-OBC) ছাত্র-বৃত্তি বা স্টাইপেন্ড দেয় সরকার। এ জন্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে গাত্রদাহ আছে। কিন্তু ইতিহাস বলছে, সেই বৈদিক আমল থেকে এবং পরবর্তী গুপ্তযুগ-শুঙ্গযুগ সাতবাহন-সেন-মুসলিম-ব্রিটিশ সব যুগে সংস্কৃত শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণ ছাত্রদের ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হত। বিশেষ করে উচ্চ মেধাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছাত্ররা অবশ্যই ছাত্র-বৃত্তি পেত। বিদ্যাসাগরও পেতেন। ওই সব টোল-চতুষ্পাঠী বা সংস্কৃত মাধ্যম বিদ্যালয়ে শূদ্র তথা তফসিলিদের প্রবেশাধিকার ছিল না, সেহেতু তাদের ছাত্র-বৃত্তি প্রদানের ব্যাপারও ছিল না। সুতরাং তফসিলি ছাত্রদের স্টাইপেন্ড প্রথার বহু আগে থেকেই ব্রাহ্মণ ছাত্রদের স্টাইপেন্ড ব্যবস্থা চালু ছিল ভারতে।

২৩. বৈদিক-শুঙ্গ-গুপ্ত-সাতবাহন-সেন প্রভৃতি যুগে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

হরপ্পোত্তর বৈদিকযুগে বহিরাগত আর্যজাতি 'বর্ণাশ্রম' প্রথা চালু করে সব বিষয়ে নিজেদের (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য) সংরক্ষণ ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে। ধর্ম-শিক্ষা-রাজনীতি-অর্থনীতি সবই আর্যদের জন্য সংরক্ষিত হয়। পরবর্তী শুঙ্গ-গুপ্ত - সাতবাহন-সেন প্রভৃতি যুগেও ব্রাহ্মণরা সমানভাবে সংরক্ষণের সুযোগসুবিধা প্রাপ্ত হয়। সবযুগেই ব্রাহ্মণ ছিল উপরের জাতি। তাদের কথামতন রাজনীতি করতে হত ক্ষত্রিয়দের এবং ব্যবসা করতে হত বৈশ্যদের। ব্রাহ্মণরা সকলের নিকট থেকে প্রচুর পরিমাণে দান-ঘুষ-উপহার-পুরস্কার লাভ করত। ব্রাহ্মণের নির্দেশে ক্ষত্রিয় রাজারা বৌদ্ধ বা শূদ্রদের উপর প্রবল নির্যাতন চালাত এবং বৌদ্ধ বা শূদ্রদের যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করত।

২৪. বৌদ্ধযুগ-মুসলমানযুগ-ব্রিটিশ আমলে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

বৌদ্ধযুগ হল সাম্যবাদী শাসনের যুগ, গণতন্ত্রের যুগ, জাতিভেদ প্রথার বিরোধীযুগ। অজাতশত্রু-কালাশোক-অশোক-বৃহদ্রথ-গোপাল-দেবপাল-ধর্মপাল প্রভৃতি যুগে বৌদ্ধ ধর্মই ছিল রাষ্ট্রধর্ম। এসব যুগে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা করা হলেও ব্যক্তি ব্রাহ্মণের বিরোধিতা করা হতো না। ব্রাহ্মণরাও বৌদ্ধরাজাদের দরবারে উচ্চপদে আসীন ছিল, চাকরি করত। মোট কথা, ব্রাহ্মণরা অস্পৃশ্য ছিল না। পরবর্তী মুসলমানযুগেও মুসলমান শাসকরা ব্রাহ্মণদের সহযোগিতায় সরকার চালাতেন। উচ্চপদে ও চাকরিতে বহু ব্রাহ্মণ ছিল। পরবর্তী ব্রিটিশ আমলেও প্রায় একই চিত্র। ব্রাহ্মণরা যদি বৌদ্ধযুগে বা মুসলমানযুগে অস্পৃশ্য হত তাহলে এতদিন তারাও পিছিয়ে থাকতো। মুসলমান আমলে চাকরিতে ব্রাহ্মণদের জন্য ৪০শতাংশ সংরক্ষণ চালু ছিল। এই আমলে ভারতীয়দের নিকট থেকে 'জিজিয়া কর' নেওয়ার আইন হয়েছিল। ব্রাহ্মণরা সেসময় বলেছিল, তারা বহিরাগত আর্য

বংশোদ্ভূত। ফলে, জিজিয়া কর থেকে মুক্তি পায় ব্রাহ্মণরা। কিন্তু মূলনিবাসী বৌদ্ধ বা শূদ্ররা (SC-ST-OBC) জিজিয়াকর থেকে মুক্তি পেত না। তবে যারা ইসলামে ধর্মান্তরিত হত তারা ছাড় পেত। মুসলমান আমলে মুসলমান-ব্রাহ্মণ যৌথ আঁতাতে বৌদ্ধ ও শূদ্রদের উপর নির্যাতন চলত। বৌদ্ধদের ম্লেচ্ছ, অচ্ছুৎ জাতিতে পরিণত করা হয়েছিল। মুসলমান শাসকরা ব্রাহ্মণ মন্ত্রী-আমলা-কর্মচারীদের পরামর্শ শুনতেন। ফলে বহিরাগত মুসলমান শাসন হটানোর জন্য ব্রাহ্মণরা কোনো স্বাধীনতা আন্দোলন করেনি। পরবর্তী ইংরেজ আমলে ইংরেজ সরকার শূদ্রদের মধ্যে শিক্ষা ও অন্যান্য অধিকার প্রদান করে। হিন্দু ধর্মের অনেক কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও আইন তৈরি করে। এর ফলে, একসময় ব্রাহ্মণরা ইংরেজ বিরোধী হয়ে ওঠে। তারই ফলশ্রুতি ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা উঁচুবর্ণের হিন্দুদের স্বাধীনতা।

২৫. বহুবিবাহে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

আর্য-বহির্ভূত অনার্য তথা শূদ্র-তফসিলিবর্গের (SC-ST-OBC) মধ্যে পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা ছিল না। তবে প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর সাংসারিক কারণে দ্বিতীয় বিবাহের রীতি ছিল শূদ্রদের মধ্যে। সতীদাহ প্রথা ছিল শুধু আর্য সমাজের তিনবর্ণের (ব্রাহ্মণ- ক্ষত্রিয়-বৈশ্য) মধ্যে। বৌদ্ধ-শূদ্র-তফসিলিবর্গে সতীদাহ প্রথা ছিল না। বরং বিধবারা চির বিধবাই থাকতো অথবা প্রয়াত স্বামীর ভাইয়ের সঙ্গে বিধবা বৌদির বিবাহ হত। দ্বিতীয় বর থেকে দেবর বা দেওর শব্দের উৎপত্তি। আর্য-সমাজের পুরুষেরা স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও একাধিক বিবাহ করত। জাতিভেদ প্রথা রক্ষার জন্য আর্যসমাজের মেয়েদের সঙ্গে শূদ্রদের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। আবার নারীর বাল্য বিবাহ ছিল। ১০ বছরের মধ্যে বিবাহ দেওয়া হত। কিন্তু পাত্র কোথায়? তাই এক পুরুষের গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হত বহু কুমারী মেয়েকে। বাঙলায় সেন আমলে (১০৫০—১২০০ খ্রিঃ) কৌলিন্য প্রথা চালু হয়। কুলীন ব্রাহ্মণরা বহুবিবাহ করত। ব্রিটিশ আমলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ সমাজে বিধবা বিবাহ চালু ও পুরুষের বহু বিবাহ রদ আন্দোলন ও আইন হয়। সৎসঙ্গ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন পুরুষের বহুবিবাহ প্রথার সমর্থক।

২৬. গরুর পরিবর্তে জুতো উপহারে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

একটি প্রবাদ আছে—'গরু মেরে জুতো দান'। এর অর্থ সুবিপুল পরিমাণে ক্ষতির বিনিময়ে অল্পকিছু ক্ষতিপূরণ। আমরা সকলেই জানি গরুর চামড়া থেকে জুতো বা অন্যান্য চামড়ার দ্রব্য তৈরি করা হয়। প্রাচীনকালে মুচি তথা চর্মকাররা গরুকে হত্যা করে তার চামড়া দিয়ে জুতো প্রভৃতি চামড়ার জিনিস বানাতেন। গো-হত্যাকে মহাপাপ বলে গণ্য করা হত। তাই চর্মকাররা গো-হত্যা নামক পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণকে জুতো দান করতেন। প্রত্যেক গরুহত্যার জন্য একজোড়া জুতো উপহার পেতেন ব্রাহ্মণ। চর্মকাররা মনে করতেন, ব্রাহ্মণকে জুতো দান করলে গো-হত্যার মতন পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণরাও মহানন্দে এই জুতো নিতেন। চর্মকাররা কোনো অ-ব্রাহ্মণ বা শূদ্রকে জুতো দান করতেন না।

২৭. আই সি এস পরীক্ষায় ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

আই. সি. এস. (ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষার মাধ্যমে আমলা-প্রশাসনিক কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয় ব্রিটিশ আমলে। এই প্রশাসনিক পদে (Administrative) কোনো ভারতীয়কে নেওয়া হত না। ভারতীয়দের চাকরি দেওয়া হত সহকারী প্রশাসক বা তার নিচে করণিক পদে। এই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ভারতীয়দের বসতে দেওয়া হত না। ১৮৪৩ সালে হিন্দু কলেজের (প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) ব্রাহ্মণ ছাত্ররা সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছিল ঃ (১) আই সি এস পরীক্ষায় ভারতীয়দের সংরক্ষণ দিতে হবে, (২) বয়স ও নম্বরের ছাড় দিতে হবে। অনেক পরে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের এই দাবি মেনে নেয় এবং সংরক্ষণ প্রদান করে ভারতীয়দের। সে সময় শূদ্রদের শিক্ষার অধিকার ছিল না বা শূদ্রদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন ছাত্রও ছিল না। ফলে, এসমস্ত চাকরি ও পরীক্ষায় ভারতীয় হিসেবে সংরক্ষণ নিত শুধু ব্রাহ্মণ ছাত্ররাই।

২৮. ডান-বাম রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব পদে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

ব্রিটিশের সহযোগিতায় ব্রাহ্মণ নেতাদের উদ্যোগে ১৮৮৫ সালে কংগ্রেস মঞ্চ তৈরি হয়েছিল, পরে এটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯১৬ সালে অ্যানি বেশান্ত ও বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে পৃথকভাবে হোমরুল লিগ দল তৈরি হয়েছিল। এঁরা ব্রাহ্মণ বা উঁচুবর্গীয়। ১৯২০ সালে চীনের তাসখন্দে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সিপিআই পার্টির জন্ম হয়। ১৯৬৪ সালে সিপিআই ভেঙে তৈরি হয় সিপিআইএম। ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ফরোয়ার্ড ব্লক পার্টি হয়। ১৯৮৪ সালে বিজেপি। এছাড়া, আর এসপি, এসইউসি আই, তৃণমূল কংগ্রেস প্রভৃতি বহু দলের জন্ম হয়েছে ব্রাহ্মণ সহ উঁচুবর্গীয় নেতাদের উদ্যোগে। এদের মধ্যে মার্কসবাদী দলগুলোকে বামপন্থীদল বলা হয়, অন্যান্যদের বলা হয় ডানপন্থী। এসমস্ত দলের নেতৃত্বে, কর্তৃত্বে কেবল ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈশ্য-ক্ষত্রিয়দের আধিক্য। দলের প্রতিষ্ঠাতা যেহেতু তারা যেহেতু তাদের জাতির প্রাধান্য অগ্রগণ্য। দু'একজন তফসিলি-অনগ্রসর এসব দলে উপরতলায় থাকলেও ব্রাহ্মণ্যবাদের কাছে মাথা মুড়িয়ে তাঁদেরকে থাকতে হয়। যেমন মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্র। জাতিতে ইনি যাদব তথা শূদ্র (ওবিসি)। অথচ অন্ধভাবে তাঁকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। সে যাইই হোক, প্রচলিত ডান ও বামপন্থীদলের ওয়ার্কিং কমিটি বা পলিটবুরো মূলত ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের দ্বারা গঠিত। সেখানে তফসিলি-দলিতদের স্থান নেই। আজও পর্যন্ত অধিকাংশ জেলা বা বিধানসভা কেন্দ্রের নেতৃত্ব ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের হাতে। দু-একজন তফসিলি-অনগ্রসরকে জেলা-ব্লকের দায়িত্ব দেওয়া হলেও তাকে রাজার বাড়ির কুত্তা (কুকুর) করে রাখা হয়েছে। এরা তফসিলিদের (স্বজাতি) কথা ভুলে শুধু উঁচুবর্ণীয়দের পদলেহন করে বেড়ায়। ডান-বাম দলে তফসিলি সংরক্ষণের কোটায় জেতা বিধায়ক-সাংসদ-কাউন্সিলর-পঞ্চায়েৎ সদস্যরাও ব্রাহ্মণ্যশ্রেণির নেতা-মন্ত্রীদের দাসানুদাস ভৃত্য। দলের মধ্যে এঁদের স্বাধীন কণ্ঠস্বর নেই। পশ্চিমবঙ্গে ডান-বাম দলের মধ্যে অবস্থিত কোনো তফসিলি নেতা-মন্ত্রীর নাম জনসমক্ষে শোনা যায় না, সংবাদপত্রেও প্রচারিত হয় না। কারণ, এঁদেরকে কথা

বলার অধিকার দেওয়া হয় না। তফসিলিদের ভোটব্যাঙ্ক ধরে রাখার জন্যই দলে এঁদেরকে ব্যবহার করা হয়। এঁরা তফসিলি সংরক্ষণ পেলেও বাস্তবে এঁরা অসংরক্ষিত এবং পরাধীন। এ রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসিলি জনগণকে (৬৫—৭০%) রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে গেলে প্রচলিত ডান-বাম দলের পরিবর্তে পৃথক আম্বেদকরপন্থী দলকে শক্তিশালী করতে হবে। সংরক্ষণের কোটায় জেতা তফসিলি নেতারা ব্যক্তিগত চেয়ার ও গাড়ি-বাড়ির স্বার্থে গোলামী করে চলেছেন। এঁদের দ্বারা আম্বেদকরপন্থী আন্দোলন হবে না। এঁদেরকে বাদ দিয়ে আন্দোলন করতে হবে, দল করতে হবে। তাহলে তফসিলিরা প্রকৃত স্বাধীনতা এবং শিক্ষা-চাকরি দখল করতে পারবে।

২৯. ভিন্নবর্ণের নারীবিবাহে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

মুসলমান পুরুষরা অন্যজাতের নারী বিবাহ করে থাকে। স্ত্রীকে তারা ইসলামে দীক্ষিত করে মুসলমান বানিয়ে নেয়। ভারতে মুসলমান রাজত্ব (১২০০—১৭৫৭ খ্রিঃ) কায়েম হওয়ার বহু আগে থেকেই আর্যসমাজে ভিন্নজাতের কন্যা বিবাহের রীতি ছিল। হিন্দুসমাজে তিনপ্রকার বিবাহ—সলোম বিবাহ, অনুলোম বিবাহ ও প্রতিলোম বিবাহ। একই বর্ণের পুরুষ-নারীতে বিবাহ সলোমবিবাহ, উঁচুবর্ণের পুরুষের সাথে নিচুবর্ণের নারীর বিবাহ অনুলোম এবং নিচুবর্ণের পুরুষের সাথে উঁচুবর্ণের নারীর বিবাহ প্রতিলোম বিবাহ। প্রতিলোম বিবাহ হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ ছিল। শূদ্রবর্ণের পুরুষ উঁচুবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করতে পারতো না। আজকাল অবশ্য শূদ্রবর্ণের (SC-ST-OBC) পুরুষের সাথে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ কন্যার ভালোবাসার বিবাহ (Love Marraige) হচ্ছে। তাছাড়া, ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের যে সমস্ত অপড় মেয়েকে স্বজাতির ছেলেরা বিবাহ করতে চাইছে না, তাদেরকে তফসিলিদের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হচ্ছে। ব্রাহ্মণরা নিজেদের ভোগের স্বার্থে স্বজাতি ডিঙিয়ে নিম্নবর্ণের মেয়েকেও বিবাহ করত। ব্রাহ্মণরা তাদের নিচে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সবজাতের মেয়ে বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্ররা উপরের বর্ণের মেয়ে করতে পারবে না, এটাই ছিল

হিন্দুধর্মের সংবিধান। সৎসঙ্গ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী প্রচণ্ড শূদ্র তথা তফসিলি বিদ্বেষী ছিলেন। তফসিলিরা উপরের বর্ণের মেয়ে বিবাহ করুক—এটা তাঁর নীতিবিরুদ্ধ কাজ। তবে তফসিলিদের নিকট থেকে ইষ্টভৃতির নামে 'পয়সা' নেওয়ার বেলায় তাঁর কোনো বাধা ছিল না। ব্রাহ্মণরা স্বজাতির কন্যা ছাড়াও অন্যান্য বর্ণের কন্যা বিবাহ করত। শূদ্ররা শূদ্রকন্যা ব্যতীত অন্য বর্ণের কন্যা বিবাহ করতে পারতেন না।

৩০. সরকার পরিচালনায় ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

ডান-বাম দলগুলোর বীজ ব্রাহ্মণদের রক্ত দ্বারা তৈরি। এই বীজ থেকে গাছ ও তার ফলও ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা পুষ্ট। সরকার গঠন হল ব্রাহ্মণ্যবাদী বীজ থেকে তৈরি গাছের ফল। স্বভাবতই সেই ফল তফসিলিদের ভাগে পড়বে না। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ চলে গেল। তারপর স্বাধীনতার নামে ভারতে শুরু হল ব্রাহ্মণ্য শ্রেণির রাজত্ব, যা বৈদিক আর্যযুগেরই পুনঃপ্রবর্তন। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় ১৯৪৭ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত যাদের নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রীত্ব গঠন করা হল তারা সবাই ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি বাঙালী উঁচুবর্গীয় সমাজের বাসিন্দা। মন্ত্রীসভার অর্ধেকের বেশি বারোয়ানা দপ্তর রইল বা এখনো আছে সেই ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের হাতে। এ রাজ্যের বিধানসভা, মন্ত্রীসভা এবং রাজনীতি, একশোভাগ ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সহ উঁচুবর্গীয়দের জন্য সংরক্ষিত। আজকাল হিন্দুত্ববাদীরা গলা ফাটাচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে। তাদের দাবি, ১৯৪৭-এর আগে মুসলমান রাজত্ব তথা মুসলমান প্রধানমন্ত্রী (মুখ্যমন্ত্রী) ছিলেন অবিভক্ত বঙ্গে। এহেন বঙ্গকে মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, জ্যোতি বসু—আচার্য কৃপালনি সহ একাধিক নেতারা। তাঁরা বঙ্গভঙ্গ চেয়েছিলেন। তাঁরা নাকি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের স্বার্থে বঙ্গভঙ্গ চেয়েছিলেন। প্রশ্ন হল, শ্যামাপ্রসাদরা কোন হিন্দুর স্বার্থে বঙ্গভঙ্গ চেয়েছিলেন? ১৯৪৭ থেকে এ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে

কেবলই উঁচুবর্ণীয় হিন্দুদের মাতব্বরি। সেখানে তফসিলি তথা নিচুবর্ণীয়রা কোথায়? এদেরকে কেন গুরুত্ব দেওয়া হল না? সরকারি সিলেবাসেও কেন এঁদের অতীত আন্দোলনের ইতিহাস লেখা হল না? অতএব, শ্যামাপ্রসাদদের বঙ্গভঙ্গ স্রেফ উঁচুবর্ণীয়দের স্বার্থে। তফসিলিদের নির্বোধ অংশ এহেন হিন্দুত্ববাদ (ব্রাহ্মণ্যবাদ) বুঝতে চাইছে না। শ্যামাপ্রসাদরা বঙ্গভঙ্গ করে এবং পশ্চিমবঙ্গ তৈরি করে এ রাজ্যের রাজক্ষমতাটা ব্রাহ্মণ্যশ্রেণির জন্যই সংরক্ষিত বা সুরক্ষিত করেছিলেন।

৩১. রাজ্যসভায় ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

ভারতীয় রাজনীতিতে কেন্দ্রীয়স্তরে রয়েছে দুটি কক্ষ—উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ। রাজ্যসভা হল উচ্চকক্ষ এবং লোকসভা হল নিম্নকক্ষ। এছাড়া রাজ্যস্তরে রয়েছে বিধানসভা। লোকসভা ও রাজ্যসভার প্রতিনিধিদের সাংসদ (MP) বলা হয়। বিধানসভার প্রতিনিধিদের বলা হয় বিধায়ক (MLA) । লোকসভা ও বিধানসভার প্রতিনিধিরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন। রাজ্যসভার প্রার্থীরা নির্বাচিত হন রাজ্যের বিধায়কদের ভোটে। সংবিধানে কেন্দ্রীয় লোকসভা ও রাজ্যের বিধানসভায় তফসিলি সংরক্ষণ রয়েছে কিন্তু কেন্দ্রীয় রাজ্যসভায় তফসিলি সংরক্ষণ নেই। ফলে, লোকসভা বা বিধানসভায় তফসিলি প্রার্থীরা নির্বাচিত হলেও রাজ্যসভার ভোটে তফসিলিদের টিকিট দেওয়া হয় না। ভারতের লোকসভায় মোট আসন ৫৪৩। এর মধ্যে ১২০টি আসন এসসি-এসটিদের জন্য সংরক্ষিত। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় মোট আসন ২৯৪। এর মধ্যে ৮৪টি আসন এসসি-এসটিদের জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু কেন্দ্রীয় রাজ্যসভায় মোট আসন ২৫০। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৬ জন সাংসদকে নির্বাচিত করা হয় রাজ্যসভার জন্য। এখানেই রয়েছে শুধু ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ। ১৯৪৭ থেকে এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে সরকার চালাচ্ছে কংগ্রেস, বামফ্রন্ট এবং তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতিটি দলই ব্রাহ্মণ্যবাদীদের হাতে তৈরি এবং পরিচালিত। রাজ্যসভায় তফসিলি

সংরক্ষণ না থাকবার জন্য এই দলগুলো ভুলেও কোনো তফসিলি ব্যক্তিকে রাজ্যসভায় দাঁড় করায় না। অথচ, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ৮৪ জন তফসিলি বিধায়ক আছেন। প্রথমত এঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদী ডান-বাম দলের টিকিটে বিজয়ী বিধায়ক, দ্বিতীয়ত ডান-বাম বিভিন্ন দলেও বিভক্ত। এঁরা ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন হতে পারলে অবশ্যই দু'-একজন তফসিলি ব্যক্তিকে সাংসদ হিসাবে রাজ্যসভায় পাঠাতে পারতেন। কিন্তু ডান-বাম দলের এসসি-এসটি বিধায়করা ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চতম নেতাদের গোলাম, ভৃত্য ও চামচা। এঁরা শিরদাঁড়াহীন অমেরুদণ্ডী এককোষী প্রাণীবিশেষ। যে রাজ্যে বাহ্মণ্যবাদী দল সরকার চালাচ্ছে সেই রাজ্যে রাজ্যসভায় সংরক্ষণের কোটায় শুধু উঁচুজাতের প্রার্থীরাই নির্বাচিত হচ্ছেন। বিহার-উত্তরপ্রদেশের মতন রাজ্যে সরকার চালাচ্ছে দলিত-অনগ্রসরদের দল। ওইসব রাজ্য থেকে তফসিলি সাংসদ নির্বাচিত হচ্ছেন রাজ্যসভায়।

৩২. রক্ষিতা, দেবদাসী ও বেশ্যাগমনে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

বাহ্মণরা সলোম বিবাহের নামে স্বজাতির মেয়ে এবং অনুলোম বিবাহের নামে নিচের বর্ণের মেয়েকে স্ত্রী রূপে ভোগ করত। শুধু তাই নয়, এছাড়া তারা বাড়িতে রক্ষিতা রাখত, মন্দিরে দেবদাসী রাখত এবং বেশ্যালয়েও যেত। নারী ভোগের জন্য সর্বত্রই তাদের সংরক্ষণ ছিল। ভারতে বেশ্যালয় সৃষ্টির উদ্যোক্তা ব্রাহ্মণরা। মন্দিরে পরিচারিকাদের দেবদাসী বানিয়ে ভোগ করত পুরোহিতরা। তাদের অনেক সন্তানকে মেরে কবরে দেওয়া হত। বহু মন্দিরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল খুঁড়লে আজও হাড়গোড় মিলতে পারে। ওইসব দেবদাসীর গর্ভজাত জীবিত সন্তানদের 'হরিজন' বা ভগবানের সন্তান বলে আখ্যায়িত করা হত। কংগ্রেস নেতা মি. গান্ধি ভারতের তফসিলিদের 'হরিজন' বা অবৈধসন্তান আখ্যা দিয়েছিলেন। আম্বেদকর তার প্রতিবাদ করেছিলেন।

৩৩. নাম ধারণে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

হিন্দু ধর্মের সংবিধান গ্রন্থ মনুসংহিতা। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ ব্রাহ্মণের নাম হবে শুভসূচক, ক্ষত্রিয়ের নাম বলবাচক, বৈশ্যের নাম ধনবাচক এবং শূদ্রের নাম নিন্দাবাচক হবে—মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্। বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্ (২/৩১)।। আরো বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উপনাম হবে যথাক্রমে শর্ম, বর্ম, ভূতি ও দাস। যথা শুভশর্মা, বলবর্মা, বসুভূতি, দীনদাস ইত্যাদি (২/৩২)। ভারতে মুসলমান আমল পর্যন্ত পদবী প্রথা ছিল না। ব্রিটিশ আমলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ জমিদাররা প্রজাদের পদবী দান করেন। তাঁরা মনুসংহিতার বিধান মেনে নিজেরা ভালোভালো পদবী ধারণ করেছেন, শূদ্র-কৃষক-তাঁতি-মুচি-মেথর-মৎস্যজীবীদের পদবী দিয়েছেন নিন্দাবাচক।

৩৪. আমলাতন্ত্রে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা (এমএলএ/এমপি/মন্ত্রী প্রভৃতি) শুধু সরকার পরিচালনা করেন না। তার সাথে দ্বিতীয় স্তরে যুক্ত থাকেন প্রচুর ডব্লুবিসিএস, আই এ এস, আই পি এস, এগজিকিউটিভ আমলা-কর্মচারি। এঁদের নিচেও রয়েছেন প্রচুর সাধারণ কর্মচারি। সরকারের দ্বিতীয় স্তম্ভ আমলা-আধিকারিকগণ। এসডিও, বিডিও, জেলাশাসক ব্যতীত প্রত্যেক মন্ত্রীর জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক দপ্তর। প্রত্যেক দপ্তরে রয়েছেন আমলা-আধিকারিক। শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, পুলিশ, সেচ, গ্রামোন্নয়ন, স্বাস্থ্য, রেশন প্রভৃতি দপ্তর রয়েছে। প্রায় প্রতিটি দপ্তরে উচ্চপদে আমলাস্তরে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ অফিসাররাই নিযুক্ত। এমন কি তফসিলি উন্নয়ন দপ্তরের উচ্চ আধিকারিকও ব্রাহ্মণ সমাজভুক্ত। এক-আধজন তফসিলি-আমলা কোথাও থাকলে তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হয় না। একটু এদিক-ওদিক হলেই ডিমোশান বা ঘাড় ধাক্কা, বদলি। ব্রিটিশ আমলেও জেলাশাসক (DM) থেকে উচ্চপদে গভর্নর পর্যন্ত ভারতীয়দের 'পদ' দেওয়া হত না। জেলাশাসকের অধীনস্থ কিছু সহকারী শাসক (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) রূপে রাখা হত ভারতীয়দের। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ দত্ত

সংরক্ষণ না থাকবার জন্য এই দলগুলো ভুলেও কোনো তফসিলি ব্যক্তিকে রাজ্যসভায় দাঁড় করায় না। অথচ, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ৮৪ জন তফসিলি বিধায়ক আছেন। প্রথমত এঁরা ব্রাহ্মণ্যবাদী ডান-বাম দলের টিকিটে বিজয়ী বিধায়ক, দ্বিতীয়ত ডান-বাম বিভিন্ন দলেও বিভক্ত। এঁরা ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন হতে পারলে অবশ্যই দু'-একজন তফসিলি ব্যক্তিকে সাংসদ হিসাবে রাজ্যসভায় পাঠাতে পারতেন। কিন্তু ডান-বাম দলের এসসি-এসটি বিধায়করা ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চতম নেতাদের গোলাম, ভৃত্য ও চামচা। এঁরা শিরদাঁড়াহীন অমেরুদণ্ডী এককোষী প্রাণীবিশেষ। যে রাজ্যে বাহ্মণ্যবাদী দল সরকার চালাচ্ছে সেই রাজ্যে রাজ্যসভায় সংরক্ষণের কোটায় শুধু উঁচুজাতের প্রার্থীরাই নির্বাচিত হচ্ছেন। বিহার-উত্তরপ্রদেশের মতন রাজ্যে সরকার চালাচ্ছে দলিত-অনগ্রসরদের দল। ওইসব রাজ্য থেকে তফসিলি সাংসদ নির্বাচিত হচ্ছেন রাজ্যসভায়।

৩২. রক্ষিতা, দেবদাসী ও বেশ্যাগমনে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

বাহ্মণরা সলোম বিবাহের নামে স্বজাতির মেয়ে এবং অনুলোম বিবাহের নামে নিচের বর্ণের মেয়েকে স্ত্রী রূপে ভোগ করত। শুধু তাই নয়, এছাড়া তারা বাড়িতে রক্ষিতা রাখত, মন্দিরে দেবদাসী রাখত এবং বেশ্যালয়েও যেত। নারী ভোগের জন্য সর্বত্রই তাদের সংরক্ষণ ছিল। ভারতে বেশ্যালয় সৃষ্টির উদ্যোক্তা ব্রাহ্মণরা। মন্দিরে পরিচারিকাদের দেবদাসী বানিয়ে ভোগ করত পুরোহিতরা। তাদের অনেক সন্তানকে মেরে কবরে দেওয়া হত। বহু মন্দিরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল খুঁড়লে আজও হাড়গোড় মিলতে পারে। ওইসব দেবদাসীর গর্ভজাত জীবিত সন্তানদের 'হরিজন' বা ভগবানের সন্তান বলে আখ্যায়িত করা হত। কংগ্রেস নেতা মি. গান্ধি ভারতের তফসিলিদের 'হরিজন' বা অবৈধসন্তান আখ্যা দিয়েছিলেন। আম্বেদকর তার প্রতিবাদ করেছিলেন।

৩৩. নাম ধারণে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

হিন্দু ধর্মের সংবিধান গ্রন্থ মনুসংহিতা। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ ব্রাহ্মণের নাম হবে শুভসূচক, ক্ষত্রিয়ের নাম বলবাচক, বৈশ্যের নাম ধনবাচক এবং শূদ্রের নাম নিন্দাবাচক হবে—মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্। বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্ (২/৩১)।। আরো বলা হয়েছে—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উপনাম হবে যথাক্রমে শর্ম, বর্ম, ভূতি ও দাস। যথা শুভশর্মা, বলবর্মা, বসুভূতি, দীনদাস ইত্যাদি (২/৩২)। ভারতে মুসলমান আমল পর্যন্ত পদবী প্রথা ছিল না। ব্রিটিশ আমলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ জমিদাররা প্রজাদের পদবী দান করেন। তাঁরা মনুসংহিতার বিধান মেনে নিজেরা ভালোভালো পদবী ধারণ করেছেন, শূদ্র-কৃষক-তাঁতি-মুচি-মেথর-মৎস্যজীবীদের পদবী দিয়েছেন নিন্দাবাচক।

৩৪. আমলাতন্ত্রে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা (এমএলএ/এমপি/মন্ত্রী প্রভৃতি) শুধু সরকার পরিচালনা করেন না। তার সাথে দ্বিতীয় স্তরে যুক্ত থাকেন প্রচুর ডব্লুবিসিএস, আই এ এস, আই পি এস, এগজিকিউটিভ আমলা-কর্মচারি। এঁদের নিচেও রয়েছেন প্রচুর সাধারণ কর্মচারি। সরকারের দ্বিতীয় স্তম্ভ আমলা-আধিকারিকগণ। এসডিও, বিডিও, জেলাশাসক ব্যতীত প্রত্যেক মন্ত্রীর জন্য রয়েছে পৃথক পৃথক দপ্তর। প্রত্যেক দপ্তরে রয়েছেন আমলা-আধিকারিক। শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র, পুলিশ, সেচ, গ্রামোন্নয়ন, স্বাস্থ্য, রেশন প্রভৃতি দপ্তর রয়েছে। প্রায় প্রতিটি দপ্তরে উচ্চপদে আমলাস্তরে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ অফিসাররাই নিযুক্ত। এমন কি তফসিলি উন্নয়ন দপ্তরের উচ্চ আধিকারিকও ব্রাহ্মণ সমাজভুক্ত। এক-আধজন তফসিলি-আমলা কোথাও থাকলে তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া হয় না। একটু এদিক-ওদিক হলেই ডিমোশান বা ঘাড় ধাক্কা, বদলি। ব্রিটিশ আমলেও জেলাশাসক (DM) থেকে উচ্চপদে গভর্নর পর্যন্ত ভারতীয়দের ‘পদ’ দেওয়া হত না। জেলাশাসকের অধীনস্থ কিছু সহকারী শাসক (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) রূপে রাখা হত ভারতীয়দের। যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ দত্ত

পমুখ নামকরা ব্যক্তিরা সেসময় উচ্চপদ পাননি। তাঁদের ডেপুটি পদ নিয়েই থাকতে হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক রূপে জগদীশচন্দ্র বসু বা প্রফুল্লচন্দ্র রায়দের নিয়োগ করলেও চারভাগের একভাগ বেতন দেওয়া হত এবং পদোন্নতি দেওয়া হত না। ব্রিটিশ পরবর্তী স্বাধীনভারতে তফসিলিদের উপরও একই দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণদের। সরকার নিয়ন্ত্রণ, মন্ত্রীত্ব এবং আমলা — সমস্ত স্তরই ব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষিত।

৩৫. স্কুল-কলেজের সিলেবাসে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

ব্রিটিশ আমলে তিনটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল—(১) উঁচুবর্ণের হিন্দু গোষ্ঠী (ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-কায়স্থ-বৈদ্য) (২) অস্পৃশ্য তথা নিচুবর্ণের হিন্দু (SC-ST-OBC) এবং (৩) মুসলমান গোষ্ঠী। উঁচুবর্ণের হিন্দুদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—গান্ধি, নেতাজি, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, বালগঙ্গাধর, ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দীনেশ প্রমুখ শতশত ব্যক্তিত্ব। অস্পৃশ্য তথা নিচুবর্ণের মধ্যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—আম্বেদকর, হরিচাঁদ, গুরুচাঁদ, যোগেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরাও, পেরিয়ার, পঞ্চানন, রাইচরণ, অনুকূলচন্দ্র নস্কর, মঙ্গুরাম দাস, মুকুন্দ বিহারী প্রমুখ শতশত ব্যক্তিত্ব। মুসলমানদের মধ্যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন—জিন্না, আগা খাঁ, সলিমুল্লা, সীমান্ত গান্ধি, সৈয়দ আহমেদ খাঁ প্রমুখ নেতৃত্ব।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটে এবং রাজক্ষমতা আসে ব্রাহ্মণ সহ উঁচুবর্ণীয়দের হাতে। পশ্চিমবঙ্গে এ যাবৎ সরকার চালাচ্ছে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের তৈরি ডান-বাম দল। এই সরকারের. শিক্ষাপরিষদ যথা মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ, উচ্চমাধ্যমিক কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি প্রভৃতি পরিষদই সিলেবাস বা পাঠ্যসূচি রচনা করে থাকে। এখানে দেখা যাচ্ছে কেবল উঁচুবর্ণের হিন্দু এবং মুসলমানদের ইতিহাস ও নাম-ধাম পড়ানো হচ্ছে। বাদ দেওয়া হয়েছে অস্পৃশ্য তথা নিচুবর্ণীয়দের (SC-ST-OBC) ইতিহাস। এর প্রধান কারণ ঃ (১) উঁচুবর্ণীয়দের ইতিহাস পড়িয়ে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসিলিদের মন জয় করা এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি তফসিলিদের শ্রদ্ধা-আনুগত্য অক্ষুণ্ণ রাখা। (২) তফসিলিদের

ইতিহাস পড়ানো হলে তফসিলিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জন্মাবে। তারা নিজেদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের স্বরূপ বুঝতে পারলে আর ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের অনুগত বা দাসত্ব করবে না। মোট কথা, রাজ্যের তফসিলিভুক্ত জনগণকে দাবিয়ে রাখার উদ্দেশে তফসিলিদের ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে, সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করা হচ্ছে। ব্রাহ্মণশ্রেণির ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে। যেন তারাই সমাজদরদী, তারাই দেশপ্রেমিক, তারাই স্বাধীনতা সংগ্রামী। ব্রাহ্মণরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে সরকারি সিলেবাসে নিজেদের ইতিহাসকে সংরক্ষিত করেছে। ধূর্ত ব্রাহ্মণ লেখকগণ রোমের দাসপ্রথা লিখছেন কিন্তু ভারতে বর্ণাশ্রমপ্রথা তৈরি করে কিভাবে যুগযুগ ধরে শূদ্র তথা তফসিলিদের উপর নির্যাতন করা হয়েছে এবং আজও 'দাস' বানিয়ে রাখা হয়েছে, সেই ইতিহাস লিখছেন না। ভারতের ব্রাহ্মণরা যে দাসব্যবস্থা আজও চাপিয়ে রেখেছে তা পৃথিবীতে বিরল।

৩৬. রাস্তা ও এলাকার নামকরণে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

ভারতে যতদিন ইংরেজ শাসন ছিল তারা ইংরেজ কবি-ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক-রাজনীতিকদের নামে রাস্তা, এলাকার নামকরণ করত—শেক্সপীয়ার সরণী, ডালহৌসি, রিপন স্ট্রিট, ওয়েলিংটন, ভিক্টোরিয়া ইত্যাদি। ১৯৪৭ সালে রাজক্ষমতা আসে ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের হাতে। এখন সেইসব এবং নতুন নতুন রাস্তা, পল্লী, ভবন, প্লাটফর্ম, উদ্যান, সেতু প্রভৃতির নাম রাখা হচ্ছে ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের নামে—রবীন্দ্রসরণী, রবীন্দ্র সেতু, রবীন্দ্র সরোবর, বাঘাযতীন, কৃষ্ণমোহন ব্যানাজী হল্ট, রামমোহন সরণী, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, অরবিন্দ নগর, নেতাজীনগর, শরৎপল্লী, রামকৃষ্ণপল্লী, সারদাপল্লী ইত্যাদি। কোথাও এসসি-এসসি-ওবিসি নেতা-মনীষীদের নামে নামকরণ হয় না। শহরতলীতে তফসিলিভুক্ত লোকেরা বসবাস করলেও তাঁরা স্বজাতি সম্পর্কে সচেতন নন। তাঁরাও ব্রাহ্মণদের অনুসরণে সব ব্রাহ্মণ্য দেবায়ঃ নমঃ করে বেড়াচ্ছেন।

৩৭. স্ট্যাচু বা আবক্ষমূর্তি নির্মাণে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

কলকাতা থেকে লাগোয়া শহরতলী, জেলাশহর, নদী-নালা পেরিয়ে সুদূর সুন্দরবন, বীরভূম-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার গ্রামে অবস্থিত বিডিও অফিস বা বিভিন্ন রাস্তা, মার্কেট সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, গান্ধি, ইন্দিরা প্রমুখের স্ট্যাচু বা আবক্ষমূর্তি স্থাপিত হচ্ছে। কলকাতা শহরের প্রতিটি রাস্তায়, ধর্মতলা চত্বরে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ নেতা-মনীষীদের মূর্তির ছড়াছড়ি। এঁদের মূর্তি হোক, অসুবিধা নেই। কিন্তু তফসিলি সমাজের কোনো নেতা-মনীষীর নামে রাস্তাঘাট বা তাঁদের মূর্তি কি হতে পারে না? গ্রামে-গঞ্জেও তো হতে পারতো। গ্রামের বিদ্যালয় বা কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তো কোনো ব্রাহ্মণ-কায়স্থ মহাপুরুষের একবিন্দু অবদান নেই। সেগুলো তো গ্রামের শিক্ষাদরদীরাই করেছেন। তাছাড়া, ব্রিটিশ আমলে আম্বেদকরের পাশাপাশি অনেক দলিত নেতাও তো নবজাগরণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মূর্তি কি করা যায় না? আসল কথা, ব্রাহ্মণ নেতা মনীষীদের নাম প্রচার করে তফসিলিভুক্ত মানুষদের মন জয় করে ব্রাহ্মণদের প্রতি তফসিলিদের দাসত্ব অটুট রাখার চক্রান্ত হচ্ছে। সহজ-সরল-উদার-নির্বোধ তফসিলি (SC-ST-OBC) মানুষেরা তা বোঝেই না।

৩৮. প্রতিকৃতি প্রদর্শনে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

সরকারি অফিসে, ক্লাবঘরে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘরে, সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে সর্বত্রই ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সমাজের নেতা-মনীষী-গায়ক-নায়কদের প্রতিকৃতি টাঙানো হয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি, সুভাষচন্দ্র, নেহরু, রামকৃষ্ণ, বিকেকানন্দ প্রমুখের প্রতিকৃতি সগৌরবে স্থান পেয়েছে। যে রাসমণির দৌলতে আজ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দরা ভগবান-অবতার-সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন সেই রাসমণিকে কেউ মনেই রাখে না। রামকৃষ্ণ মিশন, মঠ, বিবেকানন্দ মিশন সর্বত্রই রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ এবং

হাজারো পাগড়িধারী নন্দ মহারাজের প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হয়, এমনকি বহিরাগত নিবেদিতার প্রতিকৃতিও সগৌরবে স্থান পায়, সেখানে রাসমণি একেবারেই ব্রাত্য। রাসমণির স্মৃতিতে কেউ স্কুল, মিশন, মঠ বানায়নি। রাসমণির প্রতি এ ধরনের আচরণের প্রধান কারণ তিনি জাতিতে শূদ্র-কৈবর্ত, ছোটজাত। তফসিলিভুক্ত কোনো নেতা-মনীষীর প্রতিকৃতির ঠাঁই নেই কোথাও। ইদানীং সরকারি নির্দেশে কোথাও কোথাও আম্বেদকরের প্রতিকৃতি রাখা হচ্ছে। চাঁদ সওদাগরের বাম হাতে মনসাপুজোর মতন ঘটনা। তফসিলিভুক্ত মানুষদের বাড়িতেও ব্রাহ্মণ সমাজের মনীষীর প্রতিকৃতি রয়েছে কিন্তু তফসিলিভুক্ত মনীষীদের প্রতিকৃতি নেই। এসব সম্পর্কে কিছু বললে তফসিলি লোকেরা আবার জ্ঞানবাচক কথা বলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যে থেকে থেকে এঁরা নিজেদের অজান্তেই স্বজাতিবোধ হারিয়ে ফেলেছেন। ব্রাহ্মণরা কিন্তু তাদের স্বজাতিচেতনায় অত্যন্ত প্রখর ও আন্তরিক।

৩৯. সরকারি চাকরিতে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

ভারতে শুধু বৌদ্ধযুগে (মৌর্য, পাল) সরকারি চাকরিতে বৌদ্ধ তথা তফসিলিদের (SC-ST-OBC) কর্মসংস্থান ভালোই ছিল। পাশাপাশি ব্রাহ্মণদেরও স্থান ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী শুঙ্গ গুপ্ত-সাতবাহন-সেন প্রভৃতি যুগে সরকারি চাকরিতে একচেটিয়া অধিকার ছিল ব্রাহ্মণদের। মুসলিম যুগেও ব্রাহ্মণদের প্রায় ৪০ শতাংশ সংরক্ষণ ছিল। শিক্ষায় এগিয়ে থাকবার জন্য ইংরেজ আমলেও চাকরিতে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারতের রাজক্ষমতা আসে ব্রাহ্মণ সহ উঁচুবর্ণীয়দের হাতে। সেই দৌলতে তাদের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম হয়। তার প্রমাণ ১৯৯০ সালে প্রকাশিত মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত এই রিপোর্টে দেখানো হয়েছে ভারতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সহ উঁচুজাতদের সংখ্যা মাত্র ১৫ শতাংশ। এরা সরকারি চাকরিতে ৮৭ শতাংশ পদ দখল করে রয়েছে। বিপরীতে এসসি-এসটি-ওবিসি-মুসলিম-বৌদ্ধ মিলিয়ে ভারতের জনগণ ৮৫ শতাংশ। সরকারি চাকরিতে তারা মাত্র ১৩টি আসল দখল করতে পেরেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে এসসি-এসটি-ওবিসি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংরক্ষণ ৪৯.৫ শতাংশ। বাকী

৫০.৫ শতাংশ চাকরি ব-কলমে ১৫ শতাংশ উঁচুবর্ণীয়দের জন্য সংরক্ষিত। পশ্চিমবঙ্গে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্যদের জনসংখ্যা মাত্র ৫ শতাংশ। চাকরিতে এরা সংরক্ষণ ভোগ করছে ৫৫ শতাংশ। বিপরীতে ৯৫ শতাংশ জনগণ এসসি-এসটি-ওবিসি এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু। এদের ভাগে মাত্র ৪৫ শতাংশ। ১৯৪৭ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকরিতে প্রায় আড়াই লক্ষ তফসিলি সংরক্ষিত পদ অসংরক্ষিত করে উঁচুজাতদের দ্বারা পূরণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাকরিতে ১৯৭৬/৭৭ সালে তফসিলি সংরক্ষণ আইন পাশ করা হয়। এর আগে এ রাজ্যে তফসিলিদের চাকরি দেওয়া হত না। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতেও এধরনের দৃষ্টান্ত আছে।

৪০. ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থায় ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

সরকারি চাকরিতে সাংবিধানিক সংরক্ষণ নীতি থাকলেও তফসিলিরা বঞ্চিত হয়ে চলেছে। কারণ, নেতা-মন্ত্রী-আমলা-আধিকারিক—ইন্টারভিউ বোর্ডের চাবিকাঠি ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের হাতে। ১৯৯২ সালে গ্যাটচুক্তি ভিত্তিক আইন হয়েছে—উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়ন। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাও ক্রমশ প্রাইভেট মালিকের হাতে দেওয়া হচ্ছে। অর্থনীতির হিসাব করে দেখা যাচ্ছে কলকারখানা বা শিল্পসংস্থার মালিকানা উঁচুজাত সমাজের হাতে। তারা শিল্পের নামে কৃষকদের জমি লুঠ করছে। জনগণ দ্বারা নির্বাচিত সরকারই যেখানে তফসিলিসংরক্ষণের প্রতি বিমাতৃ সুলভ আচরণ করে থাকে সেখানে ব্যক্তিমালিকরা কখনোই তফসিলি দরদী হতে পারে না। তারা কখনোই তফসিলি সংরক্ষণ মেনে নেবে না। তফসিলিরা যদি রাজক্ষমতা পেত তাহলে ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থাতেও সংরক্ষণ কার্যকরী করতে পারত। একমাত্র রাজ ক্ষমতার দ্বারা সরকারি বা প্রাইভেট সংস্থায় তফসিলি সংরক্ষণ কার্যকরী করা সম্ভব। দেখা যাচ্ছে, এই ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থায় ব্রাহ্মণরা তাদের মামা-কাকা-দাদা-চাচা ধরে চাকরিতে ঢুকে যাচ্ছে। মেধাগত যোগ্যতার চেয়ে আত্মীয়তা, পরিচিতির যোগ্যতাই বেশি কার্যকরী ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থায়। সেটা ব্রাহ্মণদের আছে, তফসিলিদের নেই।

৪১. স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশনে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

১৯৪৭ সালে ভারতের মূল ভূখণ্ডের রাজক্ষমতা আসে উঁচুজাতদের হাতে। সরকার পরিচালনা থেকে শুরু করে সরকারি অফিসের চাবিকাঠি তাদের হাতে আসে। সে সময় যে কোনো প্রকারে ন্যূনতম অষ্টমশ্রেণি পাশ সার্টিফিকেট বের করে অনেকেই চাকরিতে ঢোকে। দ্বিতীয়ত, বয়স উত্তীর্ণদের মধ্যে অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে পেনশনের আওতায় আসেন। অনেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করেও মামা-দাদা-চেনা- পরিচিতের ভিত্তিতে পেনশন তালিকায় নাম লিখিয়ে দেন। তফসিলি তথা নিম্নবর্গভুক্ত বহু লোক স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেও তাঁদেরকে পেনশনভুক্ত করা হয়নি। সরকারি অফিসেও এগুলো দেখাশুনোর জন্য তফসিলি কর্মচারি খুব একটা ছিলেন না। দু'একজন তফসিলি কর্মচারি থাকলেও তাঁরা ব্রাহ্মণদের ভয়ে স্বজাতির জন্য কিছুই করতে পারেননি। আজও সরকারি অফিসে তফসিলি-কর্মচারিদের অবস্থা কোণঠাসা।

৪২. সাহিত্য-সংস্কৃতি-চলচ্চিত্র জগতে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

কবি-সাহিত্যিক-লেখক-গায়ক-নায়ক-চলচ্চিত্র অভিনেতা, চিত্রশিল্পী যদি ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সমাজের লোক হন এবং উঁচু তকমাধারী পদবীওয়ালা যদি হন তাহলে সর্বত্রই তাঁরা অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন। তাছাড়া, বংশ পরম্পরায় তাঁরা এসব পেশা বা কাজে নিযুক্ত থাকার দরুণ উত্তরসূরীরা অতি সহজেই সুযোগ পেয়ে যান। পশ্চিমবঙ্গে এসব পেশায় মণ্ডল-নস্কর-গায়েন-মিস্ত্রী পদবীধারীরা সুযোগ পান না। সুযোগ পেলেও তাঁদের পদবী পরিবর্তন করে আত্ম পরিচয় গোপন রাখতে হয়। যেমন সলিল কুমার নস্কর নামে একজন প্রযোজক এন. কে. সলিল নামে পরিচিত। কলকাতার বড় বড় পত্র-পত্রিকায় ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা সুবিপুল লেখার সুযোগ পান, সেখানে তফসিলিবর্গের লেখকরা ব্রাত্যই রয়ে যান।

কলেজস্ট্রিট পাড়ার প্রকাশকদের সরাসরি বক্তব্য হল, উঁচু তকমাধারী পদবী না হলে বই বিক্রি হয় না। স্কুল কলেজেও তফসিলিদের রচিত ইতিহাস-ভূগোল-বাংলা ব্যাকরণ বই ধরানো হয় না। কলকাতার ব্রাহ্মণ্যবাদী স্কুলগুলো তফসিলি পদবীধারী লেখকদের বইকে পাত্তা দেয় না। লেখক- প্রাবন্ধিক বা গবেষকগণ তফসিলিদের লেখা বই কিনতে চান না অথবা তফসিলিদের বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করলেও ফুটনোটে (তথ্যসূত্র) তা স্বীকার করতে চান না। যেমন ভারতীয় সমাজে আর্থিক বা জাতিগত যে শাসন-শোষণ রয়েছে, সে বিষয়ে সবচেয়ে বড় গবেষক ও ব্যাখ্যাতা আম্বেদকর। অথচ ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সমাজের লেখকরা এসব বিষয়ে লিখতে গেলে অনেকের বইয়ের নামোল্লেখ করে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেও তাঁরা ভুলেও আম্বেদকরের নাম উল্লেখ করেন না।

৪৩. চিকিৎসা ব্যবসায় ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

সরকারি হাসপাতালে তফসিলি সংরক্ষণের কোটায় কিছু তফসিলি ডাক্তারকে চাকরি দেওয়া হলেও বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে তফসিলি পদবীধারী ডাক্তারকে চাকরি দেওয়া হয় না। কলকাতার নীলরতন, মেডিকেল, আর. জি.কর, পিজি প্রভৃতি সরকারি হাসাতালে মণ্ডল-নস্কর মিস্ত্রী-ঘরামি-গায়েন পদবীধারী ডাক্তার দেখা যায়। কিন্তু ক্যালকাটা-কোঠারী-আমরি-অ্যাপোলো-ইহডিএফ-উডবার্ন-বেলভিউ-নাইটিঙ্গেল-পিয়ারলেস প্রভৃতি প্রাইভেট হাসপাতালে সম্ভবত একজনও তফসিলি ডাক্তার নেই। শহর বা শহরতলীতে বসবাসকারী ব্রাহ্মণ-কায়স্থ রুগিরা পদবী যাচাই করে ডাক্তারের কাছে যান। আনন্দবাজার প্রভৃতি সংবাদপত্রেও মাঝে মধ্যে তফসিলি সংরক্ষণের বিরুদ্ধে লেখা হয়। অথচ, কলকাতার ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ডাক্তারদের প্রেসক্রিপশনও দক্ষিণভারতে ভেলোর বা ব্যাঙ্গালোরের হাসপাতালে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়। কলকাতা সহ সারা দেশে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সহ তথাকথিত জেনারেল ক্যাটেগরির ডাক্তাররা ভুল চিকিৎসা করে রুগি মেরে ফেলছেন। সংবাদপত্রে তা ফাঁস হয়েও যাচ্ছে। তবে ব্রাহ্মণ ডাক্তাররা ভুল করলে বল হয়—মানুষ মাত্রই ভুল হতে পারে। কিন্তু তফসিলি ডাক্তাররা ভুল করলে বলা হয়—কোটার ডাক্তার বলে এই দশা।

৪৪. গল্প-নাটক-সিনেমার কাহিনীতে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

টি.ভি., সিনেমা, নাটক, কবি-সাহিত্যিকদের রচিত গল্প-উপন্যাস প্রভৃতি কাহিনিতে চরিত্র অংকনেও জাতিভেদ প্রথা বিদ্যমান। কাহিনিতে ধনী-অভিজাত-উচ্চশিক্ষিত চরিত্রের পদবী রাখা হয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থ মার্কা। জমিদার উকিল- ডাক্তার শিক্ষক-ইঞ্জিনিয়ার-মন্ত্রী-কবি প্রভৃতি চরিত্রের পদবী রাখা হয় চক্রবর্ত্তী, সান্যাল, ঘোষাল, দত্ত, মিত্র, গাঙ্গুলী প্রভৃতি। একই কাহিনিতে যদি চাকর, রিকসাওয়ালা, দোকানদার, কাজের লোক প্রভৃতি চরিত্র থাকে, সেগুলো হয়—মণ্ডল, বাগদি, দাস, মিস্ত্রী প্রভৃতি।

৪৫. দরিদ্রতার ভিত্তিতে চাকরিতে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

ভারতীয় সংবিধানে এখন গোষ্ঠীভিত্তিক সংরক্ষণ রয়েছে। জেনারেল ক্যাটেগরির অনেকেই এখন তফসিলি-সার্টিফিকেট বের করে নাকি সংরক্ষণ নিচ্ছে। এই অভিযোগে অনেকেই দাবি তুলেছে, দরিদ্রতার ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেওয়া হোক। ঘটনা হল, দরিদ্রতার ভিত্তিতে সংরক্ষণ চালু হলে প্রথমত দেশের সব ব্রাহ্মণ ও অভিজাতরা গরীব (বিপিএল) সাজবে, ধনীরা কাগজে-কলমে তাদের ছেলে-মেয়েদের 'ত্যাজ্যপুত্র' করে গরীব সাজাবে, দ্বিতীয়ত চাকরির মৌখিক পরীক্ষায় গরীব তকমাধারী চ্যাটার্জী-ব্যানার্জীরাই চাকরি পাবে। বাদ দেওয়া হবে গরীব মণ্ডল-নস্কর-মিস্ত্রী-সরদার-গায়েন পদবীধারীদের। কারণ, রাজনৈতিক ক্ষমতার সূত্রে ব্রাহ্মণ-কায়স্থরাই রাজক্ষমতায় বসে রয়েছে। স্বভাবতই চাকরির বোর্ডও তাদের অঙ্গুলি হেলনে চলছে বা চলবে। তফসিলিরা যেদিন আত্মচেতনা লাভ করে রাজক্ষমতায় উত্তীর্ণ হবে সেদিন দরিদ্রতার ভিত্তিতে সংরক্ষণ চালু হলে তফসিলিদের ক্ষতি হবে না। দরিদ্রতার ভিত্তিতে সংরক্ষণ চালু হলে ইন্টারভিউবোর্ডে গরীব চ্যাটাজী-ব্যানার্জীরাই সুযোগ পাবে, গরীব মণ্ডল-নস্কর-গায়েনরা পাবে না। কারণ পরীক্ষক ব্রাহ্মণ-কায়স্থরা।

৪৬. 'এসসি-এসটি সেল' ও পুনাপ্যাক্টে ব্রাহ্মণের চামচাদের সংরক্ষণ

ব্রাহ্মণরা সরাসরি যেমন নানাধরনের সংরক্ষণ ভোগ করে তেমনি ব্রাহ্মণদের মতাদর্শে বিশ্বাসী তফসিলিবর্গের (SC-ST-OBC) জন্যও রাজনীতিতে সংরক্ষণ চালু করেছে। ব্রাহ্মণদের নিয়ন্ত্রিত ডান-বাম দলের টিকিটে বিভিন্ন তফসিলি সংরক্ষিত কেন্দ্রে যাদেরকে দাঁড় করানো হয় তারা ব্রাহ্মণদের মতাদর্শে বিশ্বাসী অনুগত চামচাবাহিনি। আম্বেদকর চেয়েছিলেন, তফসিলিদের পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থা সহ পৃথক প্রতিনিধিত্ব। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নেতা গান্ধি সেটা পুণাপ্যাক্ট (১৯৩২ সাল) মারফৎ রাজনীতিতে তফসিলি সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। ডান-বাম দলে বিজয়ী তফসিলিভুক্ত এম এল এ/এম পি রা ব্রাহ্মণ্যবর্গের নেতা-নেত্রীদের দাসানুদাস চামচা। এঁদের কাজ তফসিলিদের ভোটব্যাঙ্ক দ্বারা ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজনীতিকে পুষ্ট করা এবং বিনিময়ে নিজেদের ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাস-গাড়ি-বাড়ি-পকেট নিয়ে ব্যস্ত থাকা। রাজার বাড়ির পোষা কুত্তা যেমন আদর-যত্ন পায়। একইভাবে বাম-ডান দলে আজকাল আম্বেদকরের নামে এসসি-এসটি সেল বা সংগঠন গড়া হয়েছে। এই সংগঠনের তফসিলি নেতারা আম্বেদকর সম্পর্কে একবিন্দুও জানেন না। এঁদেরও কাজ ব্রাহ্মণ্যবাদী দলকে শক্তিশালী করে নিজেদের ব্যক্তিগত পাকেটকে শক্তিশালী করা। বলাবাহুল্য, আম্বেদকরপন্থী পৃথক দলিত আন্দোলনের ঘরশত্রু বিভীষণ এরাই।

আম্বেদকরপন্থী পৃথক দলিত আন্দোলনকে প্রতিহত করার উদ্দেশে ব্রাহ্মণ্যবাদী ডান-বাম দলে তফসিলি সমাজের চামচাদের ব্যবহার করা হয়। এই চামচারাই আবার জনগণকে বোঝায়, পৃথক দলিত রাজনীতির দরকার নেই। এই জাতীয় চামচাদের দ্বারা আম্বেদকরকে কোণঠাসা করে দিয়েছিলেন গান্ধি ও কংগ্রেস।

৪৭. সংবাদমাধ্যমে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

টি.ভি., রেডিও, বিভিন্ন সংবাদপত্র—সর্বত্রই ব্রাহ্মণ্যশ্রেণির নেতা-নেত্রী-মন্ত্রীদের নাম, ছবি ও বক্তব্য প্রচার করা হয়। তফসিলিভুক্ত নেতা-মন্ত্রীদের নাম প্রচার করা হয় না। পশ্চিমবঙ্গের মতন রাজ্যে বাম ও ডান কোনো দলই তফসিলি সমাজের নেতা-মন্ত্রীদের বক্তব্য সংবাদমাধ্যমে রাখতেও দেয় না।

৪৮. স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি 'বুকলিস্ট' প্রকাশিত হয়। কোন শ্রেণিতে কি কি বই ধরানো হয়েছে তা উল্লেখিত হয় বুকলিস্টে বা তালিকায়। আগেরকার দিনে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বর্গের বইয়ের লেখকরাই একচেটিয়াভাবে বইপত্র লিখতেন। ইদানীং তফসিলিবর্গের (SC-ST-OBC) কিছু লেখকও ইতিহাস, ভূগোল, জীবন বিজ্ঞান, বাংলা ব্যাকরণ প্রভৃতি বই লিখছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বিদ্যালয়গুলো বেছে বেছে কেবল ব্রাহ্মণ কায়স্থদের লেখা বই বুকলিস্টভুক্ত করছে। বাদ দেওয়া হচ্ছে মণ্ডল, নস্কর, গায়েন, জোয়ারদার, মিস্ত্রী, সরদার প্রভৃতি পদবীধারী লেখকদের বই। কারণ, এই পদবীগুলোর গায়ে তফসিলিজাতির তকমা রয়ে গেছে। কলকাতার প্রকাশকরাও তফসিলি লেখকদের বই প্রকাশের দায়িত্ব নিতে চায় না।

৪৯. ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্মের গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা প্রচারে ব্রাহ্মণ্যবাদী সংরক্ষণ

কলকাতা ও সন্নিহিত শহরতলী বা জেলাশহর এবং গ্রাম-গঞ্জের হাটে-বাজারে অবস্থিত বইয়ের দোকানে বা পাঠাগারে সর্বত্রই ব্রাহ্মণদের রচিত বই এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্মের প্রচারমূলক বই, পত্র-পত্রিকা বহুল পরিমাণে রাখা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন বইমেলাতেও ব্রাহ্মণদের বই অগ্রাধিকার পায়। কলেজস্ট্রিট পাড়ার সমস্ত বইয়ের দোকান যেন ব্রাহ্মণদের জন্য সংরক্ষিত। রামায়ণ-মহাভারত গীতা-পুরাণ-মন্ত্রতন্ত্র-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, শংকরাচার্য, বিভিন্ন দেব-দেবীর উপর রচিত বই, পত্র-পত্রিকা ঢালোয়াভাবে বিক্রি করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মের বই, আম্বেদকর রচনাবলী, তফসিলিদের রচিত দলিত আন্দোলনের বই ইত্যাদি রাখা হয় না। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সমাজের বই বিক্রেতাগণ তফসিলিদের মুক্তি আন্দোলনের বই-পত্র রাখতে চান না।

৫০. হরিজন সেবাসমিতি ও জাতপাত তোড়কমণ্ডলীতে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ মনে করে মানুষ ঈশ্বরের সন্তান। স্বভাবতই ঈশ্বর নামক পিতা/মাতার কাছে নিজেদের চাওয়া-পাওয়া, ব্যথা-বেদনার কথা বলতে পারবে তার সন্তানেরা। বাস্তব জগৎ সংসারেও আমরা সেটাই দেখছি। একই মা-বাবার পাঁচজন সন্তান তাদের ইচ্ছেমতন মা-বাবার নিকট থেকে জিনিসপত্র চেয়ে নেয়। কনিষ্ঠ সন্তান কখনোই নিজের পাওনাটা বড়ভাইয়ের মারফৎ মা-বাবার কাছে চায় না। কিন্তু হিন্দু ধর্মে দেখা যাচ্ছে বিপরীত নিয়ম। ঈশ্বরের কাছে কোনোকিছু চাইতে গেলে সরাসরি চাইতে পারবে না কনিষ্ঠ সন্তানরা। সেজন্য প্রয়োজন বড় সন্তান ব্রাহ্মণের। বিনিময়ে এই বড় সন্তান আবার ছোটছোট ভাইদের (ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি) নিকট থেকে পয়সা হাতিয়ে নেয়। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ নামক এই বড় সন্তানের বক্তব্য, ব্রাহ্মণ হল ঈশ্বরের প্রতিনিধি। ঈশ্বরের সাথে সরাসরি তার সম্পর্ক বা সংযোগ (conection) আছে। অন্যদের তা নেই। এ জন্য অন্যরা ব্রাহ্মণদের মারফৎ ঈশ্বরের কাছে তাদের দাবি-দাওয়া জানাবে। অর্থাৎ, ঈশ্বর নামক পিতা/মাতার কাছে সরাসরি কিছু চাওয়ার বা ঈশ্বরের সাথে সরাসরি কথা বলার অধিকার নেই অব্রাহ্মণদের, বিশেষ করে শূদ্রদের—এটাই হলো হিন্দুধর্মের নিয়ম বা আইন। পুজো-বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি কর্মে আমরা সেটা লক্ষ্য করছি। ঘটনা হল, হিন্দুধর্ম বা সমাজের এই রীতিনীতিই কার্যকরী করতে চেয়েছিলেন কংগ্রেসের শীর্ষতম নেতৃত্ব মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। ব্রিটিশ আমলে অস্পৃশ্য তথা তফসিলিবর্গের (SC-ST-OBC) শীর্ষতম নেতৃত্ব বাবাসাহেব আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সামনে তুলে ধরেছিলেন। এ সময় ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের শীর্ষতম প্রতিনিধি গান্ধি 'হরিজন সেবাসমিতি' (১৯৩২/৩৩ সাল) প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে বোঝাতে চেয়েছিলেন, অস্পৃশ্যদের প্রতিনিধি আম্বেদকর নন, তিনিই (গান্ধি) বা উঁচুবর্ণের নেতারা। গান্ধি প্রতিষ্ঠিত হরিজন সেবাসমিতিতে একজনও তফসিলিব্যক্তিকে সদস্যপদ দেওয়া হত না। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য সহ উঁচুবর্ণের লোকেরাই এর সদস্য হতে পারতেন। আম্বেদকরের অভিযোগ ছিল, হরিজন সেবাসমিতি যদি তফসিলিদের উন্নয়নকামী সংগঠন হবে তাহলে একজনও তফসিলিকে কেন তার সদস্যপদ দেওয়া হবে না?

একই ঘটনা ঘটেছে জাতপাত তোড়কমণ্ডলীর ক্ষেত্রেও। ১৯৩৫/৩৬ সালে কিছু ব্রাহ্মণ নেতাদের উদ্যোগে এই সংগঠনটি তৈরি হয়েছিল। জাতপাত তাড়িয়ে

দেবে, এই ইস্যুতেই তারা সংগঠন করেছিল। কিন্তু এখানেও কোনো তফসিলি নেতাকে সদস্যপদ দেওয়া হত না। এই মণ্ডলীর নেতারা নিজেদের তফসিলিদরদী বলে উপস্থাপন করে তফসিলিদের মন জয় করতে চেয়েছিলেন, যাতে আম্বেদকরের আন্দোলন ধ্বংস করা যায়। ঘটনা হল, তফসিলি জাতির লোকেরা এমনই উদার, সরল ও নির্বোধ যে গান্ধি বা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এ ধরনের চালাকি বুঝতে পারত না এবং আজও বুঝতে পারে না।

৫১. 'ওঁ' মন্ত্র উচ্চরণে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

পুজো-বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি কর্মে ব্রাহ্মণ যখন মন্ত্র-উচ্চারণ করে তখন আগে 'ওঁ' মন্ত্র উচ্চরণ করে। 'ওঁ' হল সূর্যের অপর নাম। এটাই আবার বেদের মন্ত্র। হিন্দুশাস্ত্রে রয়েছে, অ-ব্রাহ্মণ এবং নারী মাত্রই শূদ্র বা নিচুজাত। ওঁ বা দেবমন্ত্রে তাদের অধিকার নেই। এরা যখন মন্ত্র উচ্চারণ করবে তখন 'নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণ করবে আগে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ক্ষেত্রে আচমনমন্ত্র 'ওঁ', শূদ্র ও নারীর ক্ষেত্রে 'নমঃ'। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণজাতিই যে স্বতন্ত্রজীব তা বোঝানোর জন্য নানাধরনের নিয়মকানুন চালু রয়েছে।

৫২. মহিলা সংরক্ষণের নামে ব্রাহ্মণমহিলাদের সংরক্ষণ

বিধানসভা ও লোকসভায় প্রার্থীপদে মহিলা সংরক্ষণের তোড়জোড় চলছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী কংগ্রেস বিজেপি-সিপিএম-তৃণমূল সব দল মহিলা সংরক্ষণ চাইছে। বাধা দিচ্ছে মায়াবতী-লালু-মুলায়াম-নীতীশ কুমার-করুণানিধি প্রভৃতি তফসিলিবর্গের দলগুলো। এদের অভিযোগ, মহিলা সংরক্ষণের নামে উঁচুবর্ণের মহিলাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। যদি মহিলা সংরক্ষণের মধ্যে তফসিলি মহিলাদের সংরক্ষণ দেওয়া হয় তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যবাদী ডান-বাম দলগুলো মহিলা সংরক্ষণের মধ্যে তফসিলি সংরক্ষণ চাইছে না। তারা ব-কলমে উঁচুবর্ণের মহিলাদের সংরক্ষণই চাইছে।

৫৩. উচ্চশিক্ষায় ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পিএইচডি, বিজ্ঞান গবেষণা, ডিলিট প্রভৃতি ক্ষেত্রে তফসিলিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সুযোগ দেওয়া হয় না। এদেরকে আটকানোর জন্য

প্রথমত লিখিত পরীক্ষায় কম নম্বর দেওয়া হয়, দ্বিতীয়ত ইন্টারভিউ বোর্ডে মৌখিকে সুকৌশলে ছাঁটাই করা হয়। উচ্চশিক্ষার নানাক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অঢেল সুযোগ রাখা হয়েছে। গবেষণা স্তরে ব-কলমে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ছাত্র-ছাত্রীরাই বেশি সুযোগ-সুবিধা নিচ্ছে। বেশি আসন তাদের জন্যই সংরক্ষিত।

৫৪. দেব-দেবী ও অবতার তকমায় ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

ভারতে ব্রাহ্মণরাই সর্বপ্রথম কাল্পনিক দেব-দেবীর জন্ম দিয়েছে। অ-ব্রাহ্মণ তথা বৌদ্ধধর্মে দেব-দেবীর বালাই নেই। তবে ব্রাহ্মণদের তৈরি দেব-দেবীকে প্রতিহত করার উদ্দেশে বৌদ্ধদের একাংশ বিপথগামী হয়ে কিছু দেব-দেবীর জন্ম দিয়েছে। শিব, মনসা, শীতলা, শনি প্রভৃতি দেব-দেবীগুলো বিপথগামী বৌদ্ধদের তৈরি। বিপরীতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-নারায়ণ-দুর্গা-গণেশ-লক্ষ্মী-সরস্বতী-কালী-অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেব-দেবী ব্রাহ্মণদের তৈরি। এদেরকে পৌরাণিক দেবতা বলা হয়। বৌদ্ধধর্মকে প্রতিহত করার উদ্দেশে মৌর্য-উত্তর গুপ্ত-সাতবাহন প্রভৃতি যুগে পুরাণ রচিত হয় এবং এসব দেব-দেবীর উৎপত্তি ঘটায় ব্রাহ্মণরা। মুসলমান আমলে জন্ম কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য (আগমবাগীশ) কালীমূর্ত্তির জনক। অন্যদিকে শ্রীচৈতন্য (নিমাই মিত্র), লোকনাথ ঘোষাল, রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (বালক ব্রহ্মচারী)—এঁরা সাক্ষাৎ অবতার হয়ে গেছেন। মানুষ এঁদেরকে ভগবানের অবতার বলে মানে। আর্যবর্গের ক্ষত্রিয় বর্ণের রাম (কাল্পনিক চরিত্র) অবতার হয়ে গেছে। কৃষ্ণ জন্মসূত্রে শূদ্র (যাদব)। তবুও সে ব্রাহ্মণ্যবাদকে সমর্থন করার জন্য অবতার হয়ে গেছে। কৃষ্ণ কাল্পনিক চরিত্র। আর নিরীশ্বরবাদী বুদ্ধ যিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের ঘোরতর বিরোধী, তাঁর মতাদর্শকে ধ্বংস করার উদ্দেশে তাঁকে বিষ্ণুর অবতার বানিয়েছে ব্রাহ্মণরা।

৫৫. চন্দনফোঁটা দেওয়ায় ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

শহর এবং শহরতলীতে বাজারের দোকানে, অটো ও রিক্সাচালকদের নিকট থেকে চন্দনফোঁটা দিয়ে প্রণামী তোলে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। শতশত ছোট-বড় দোকান ও রিক্সা-অটোঅলার নিকট থেকে অর্থ রোজগার করে। কোনো অব্রাহ্মণব্যক্তি এই পেশায় যুক্ত হতে পারে না। কারণ জনগণ জানতে পারলে ধোলাই দেবে।

১৯৯০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত

৫৬. মণ্ডল কমিশনের রিপোর্টে ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ

(কারা প্রকৃত সংরক্ষণভোগী তার প্রমাণ এই রিপোর্ট)

শাসকশ্রেণি (বিদেশি আর্য)	জনসংখ্যা	রাজনীতি	চাকরি	ব্যবসা	জমি
১। ব্রাহ্মণ (ভূমিহার বাদে)	৩.৫%	৪১%	৬২%	১০%	৫%
২। ক্ষত্রিয়	৫.৫%	১৫%	১২%	২৪%	৮০%
৩। বৈশ্য	৬%	১০%	১৩%	৬০%	৭%
শাসকশ্রেণির সংখ্যা ও সংরক্ষণ	১৫%	৬৬%	৮৭%	৯৪%	৯২%
শাসিত শ্রেণি (মূলনিবাসী ভারতীয়)	জনসংখ্যা	রাজনীতি	চাকরি	ব্যবসা	জমি
১। ওবিসি (দলিত ওবিসি)	৫২%	৮%	৭%	২.৩%	৫%
২। এসসি-এসটি (দলিত)	২২.৫%	২২.৫%	৫%	০.২%	১%
৩। বৌদ্ধ-জৈন-শিখ ও ধর্মান্তরিত মুসলিম-খ্রিস্টান	১০.৫%	৫.৫%	১%	৩.৫%	২%
শাসিত শ্রেণির সংখ্যা ও সংরক্ষণ	৮৫%	৩৪%	১৩%	৬%	৮%

সংরক্ষণের বিচিত্র ধারা

জাতভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যবাদী সংরক্ষণ বা তফসিলি সংরক্ষণ ব্যতীত সমাজে ও রাষ্ট্রে আরো নানাধরনের সংরক্ষণ আছে যা ধর্ম-বর্ণ-জাতি-লিঙ্গ-ধনী-গরীব নির্বিশেষে সবাই কম-বেশি পেয়ে চলেছে। অথচ, সেগুলোকে কেউ সংরক্ষণ (Reservation) বলে মনে করে না। কেবল তফসিলি সংরক্ষণের বিরুদ্ধে ঘেউ ঘেউ করে চলেছে উঁচুজাতের হিন্দুসমাজ ও মার্কসবাদীরা। অন্যান্য সংরক্ষণগুলো হল—

(১) ভর্তুকি সংরক্ষণ ঃ রান্নার গ্যাস, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বিদ্যুৎ, ডিজেল, কেরোসিন, রেশনে চিনি-গম-আটা-ময়দা-তেল-সাবান প্রভৃতি দ্রব্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ভর্তুকি বা অর্থসাহায্য করে চলেছে। সমাজের ধনী, চাকরিজীবী, সচ্ছল লোকেরাও ভর্তুকিতে জিনিস নিচ্ছে। অথচ এরা তফসিলি সংরক্ষণের বিরুদ্ধে চিৎকার চেঁচামেচি করছে। সাধারণত গরীব মানুষদের পরিবারে, গ্রামে-গঞ্জে রান্নার গ্যাস, বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। সম্প্রতি গ্রামে গঞ্জে বিদ্যুৎ-গ্যাস যাওয়া শুরু করেছে। শহর ও শহরতলীর লোকেরা বহুকাল আগে থেকেই সরকারি সাহায্য পেয়ে আসছে। এরা কিন্তু গ্রামের মানুষদের কথা ভাবছে না। অথচ, গরীব মানুষের দোহাই দিয়ে এরা তফসিলি সংরক্ষণের বিরুদ্ধে চিৎকার করে নিজেদের গরীবদরদী প্রমাণের চেষ্টা করে থাকে।

(২) চিকিৎসায় সংরক্ষণ ঃ শহর ও শহরতলীতে অবস্থিত সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা বা ঔষধপত্রের সুবিধা পাচ্ছে শহরের লোকেরা। বঞ্চিত হচ্ছে গ্রামের মানুষ। কারণ, সেখানে উপযুক্ত সরকারি হাসপাতাল নেই। সরকারি ডাক্তারও নেই।

(৩) বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ ঃ দ্বাদশশ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক, বিনামূল্যে বই দান, সাইকেল, মিড-ডে-মিল প্রভৃতি রয়েছে। সমাজের ধনী ও চাকরিজীবী অংশও এসব সুযোগ পাচ্ছে। প্রকৃত দরিদ্র পরিবার কোনো সুযোগ পাচ্ছে না। কারণ, মা-বাবার চরমতম দরিদ্রতা ও অশিক্ষার কারণে তাদের ছেলে-মেয়েরা আজও স্কুলমুখী হতে পারছে না।

(৪) মহিলাসংরক্ষণ ঃ ব্রাহ্মণ সহ উঁচুবর্ণীয় সমাজের মহিলারাও তফসিলি সংরক্ষণ সম্পর্কে কটু মন্তব্য করে থাকে। অথচ, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সব মহিলার জন্যই নানাধরনের সংরক্ষণনীতি রয়েছে। কারণ, এখানে রয়েছে লিঙ্গতন্ত্র।

বর্ণতন্ত্রের মাধ্যমে যেমন ব্রাহ্মণ দ্বারা শূদ্র শোষিত হচ্ছে তেমনি লিঙ্গতন্ত্রের মাধ্যমে পুরুষের দ্বারা নারী শোষিত বা শাসিত। সেখানে মহিলা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পৃথক বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ, এখন পৃথক বালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ও হচ্ছে। আয়কর প্রদানে মহিলাদের একটু ছাড়। ট্রেনে-বাসে মেয়েদের আসন সংরক্ষণ। মেয়েরা 'সাধারণ' (General) হিসেবে সর্বত্রই প্রবেশ করতে পারে (শুধু বালক বিদ্যালয় ব্যতীত) এবং বালিকা সংরক্ষিত বিদ্যালয় বা আসনেও মেয়েদের একচেটিয়া সংরক্ষণ। ধনী পরিবারের মেয়েরাও মহিলা সংরক্ষণের সমস্ত সুযোগ পাচ্ছে। অথচ, তফসিলিদের ধনী অংশ সংরক্ষণ নিচ্ছে কেন, এই প্রশ্ন তুলছে কিছু নির্বোধ লোক। আবার অনেক নির্বোধ পুরুষ আছে মেয়েদের এই সংরক্ষণ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে থাকে। পুরুষ ও নারীর সমতা বিধানের জন্য চালু হয়েছে মহিলা সংরক্ষণ তেমনি উঁচু-নিচু জাতব্যবস্থা ধ্বংসের অন্যতম উপায় তফসিলি সংরক্ষণ। নির্বোধ লোকেরা তা কি বিচার করতে শেখে? দুঃখের কথা, ভারতের মার্কসবাদীরাও তফসিলি সংরক্ষণের গুরুত্ব বোঝেন না। অনেকে তফসিলি সংরক্ষণকে 'জাতপাত' বলে কটাক্ষ করে থাকে। তারা কি মহিলা সংরক্ষণকেও 'লিঙ্গলিঙ্গী' বলে কটাক্ষ কববে?

(৫) আন্তর্দেশীয় সংরক্ষণ ঃ ভারতের বহু ছাত্র বিদেশে পড়তে যায় তেমনি বিদেশের বহু ছাত্রও ভারতে পড়তে আসে। বিদেশী পড়ুয়াদের কোটায় পড়তে হয়। এটা রাষ্ট্রনীতি। ভারতের বহু ব্রাহ্মণছাত্রও বিদেশে পড়ছে সংরক্ষণের কোটায়। অথচ এরা দেশের তফসিলি সংরক্ষণকে সহ্য করতে পারে না।

(৬) আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয়-কোটা ঃ এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলেও কোটা রয়েছে। যেমন অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যাদবপুর, রবীন্দ্রভারতী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫% কোটা রয়েছে।

(৭) চাকরিতে রাজনৈতিক কোটা ঃ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অনুগত কর্মী-সমর্থক-নেতারা সরকারি চাকরি এবং অন্যত্র ঢুকে পড়ছে। নেতা-মন্ত্রীকে 'হাত' করে পিছনের দরজা দিয়ে চাকরি নিচ্ছে। ক্ষমতাসীন দলের ঝাণ্ডাবাহী ক্লাবগুলোও সরকারি অনুদান পায় বেশি। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ ক্ষমতাসীন দলের লোকেরাই বেশি সুযোগ নেয়। পদোন্নতি-বদলির ক্ষেত্রেও তাই। এসব ক্ষেত্রে কেউ মেধা বা যোগ্যতার প্রশ্ন তোলে না। অথচ, তফসিলি সংরক্ষণের বেলায় ঘেউ ঘেউ করে।

(৮) ম্যানেজমেন্ট কোটা ঃ ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর টাকার বিনিময়ে ছাত্র ভর্তি চলছে। নেতা-মন্ত্রীদের জন্যও কিছু কোটা

আছে। বহু অযোগ্য ছাত্র ম্যানেজমেন্ট কোটার দৌলতে ঢুকে পড়ছে। প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরিচালনার জন্য স্বশাসিত একটি বোর্ড থাকে যা সরকার নিয়ন্ত্রিত নয়। এই বোর্ডের হাতে কিছু আসন সংরক্ষিত থাকে যা অরিরিক্ত টাকার বিনিময়ে বিক্রি হরা হয়। কোনো গরীব ছাত্র এখানে সুযোগ পায় না। ধনী ও নিম্নমেধা সম্পন্ন ছাত্ররাই ম্যানেজমেন্ট কোটায় পড়তে ঢোকে।

ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-ওবিসি-মার্কসবাদী বহু ছাত্র-ছাত্রী এই ম্যানেজমেন্ট কোটায় ভর্তি হচ্ছে অথচ তারা তফসিলি সংরক্ষণের বিরুদ্ধে কুত্তার মতন ঘেউ ঘেউ করছে।

(৯) সরকারি কর্মচারিদের বেতন, পে-কমিশন, ডিএ, পেনশন ঃ দেশের অধিকাংশ মানুষ যথাসাধ্য পরিশ্রম করে দেশের সেবা করছে। কৃষক-মৎস্যজীবী-কামার-কুমোর-ছুতোর-নাপিত-মুচি-মেথর-হাঁড়ি-ডোম সবাই দেশের সেবা করছে। বিনিময়ে নিজের জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে। গণতান্ত্রিক দেশে সবাই ভোটার (২১ বছর)। সকলের ভোটে নির্বাচিত হচ্ছে সরকার। অথচ, শুধু সরকারি কর্মচারিরাই সরকারের নিজস্ব সন্তান বলে বিবেচিত। এদের জন্য পে-কমিশন, বেতন, ডিএ, পেনশন, চিকিৎসা খরচ, বেড়ানো খরচ, সন্তানের শিক্ষা খরচ প্রভৃতি সংরক্ষিত আছে। দেশের উৎপাদক শ্রেণি কৃষক-তাঁতি-মুচি-মেথর-ডোম-মৎসজীবী-ঘরামি-রাজমিস্ত্রী প্রমুখের জন্য স্থায়ী কোনো সম্মানযোগ্য মজুরী বা বেতন নেই। পেনশন তো দূরের কথা; তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম, সরকারি কর্মচারিদের যে যোগ্যতা আছে শ্রমিকদের তা নেই। পাশাপাশি এটাও তো স্বীকার করতে হবে, শ্রমিকশ্রেণির যে যোগ্যতা আছে সরকারি কর্মচারিদের তা নেই। তাহলে শুধু সরকারি কর্মচারিরা অর্থনৈতিকভাবে সংরক্ষণ পাবে কেন? সবাই তো একই হাট-বাজার থেকে একই মূল্যের জিনিসপত্র কিনছে। তাহলে ডিএ/ইনক্রিমেন্টের বেলায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অজুহাত দেওয়া হচ্ছে কেন? কাজেই, যে কোনো চাকরিজীবী লোক অর্থনীতিতে এক ধরনের সংরক্ষণ পাচ্ছে যা শ্রমিকশ্রেণি পায় না। এটা অবশ্যই বৈষম্যবাদী ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, উঁচুজাতের লোকেরাই বেশি সংখ্যক চাকরি করছে। বেতন-পে-কমিশন-ডিএ-পেনশনে তারাই বেশি লাভবান। তফসিলিবর্গের (SC-ST-OBC) কমসংখ্যক লোক চাকরিজীবী। অধিকাংশই সাধারণ শ্রমিক যারা নিজেদের কর্মের দ্বারা সমাজসেবা করে চলেছে। অথচ এদের জন্য সুনির্দিষ্ট বেতন, মজুরী বা পেনশন নেই। এরা যেন বিমাতার সন্তান।

লেখকের রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

১. যুক্তি ও মানবতাবাদ ২০০৬

২. সমাজপিতা বেণীমাধব হালদার সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপন স্মারকগ্রন্থ (সম্পাদিত) ২০০৮

৩. মণ্ডল কমিশনের রিপোর্ট ও বহুজন সমাজপার্টি ২০০৮

৪. পৌণ্ড্র সমাজ পরিচয় (সম্পাদিত) ২০১০

৫. জাগো পৌণ্ড্রসমাজ জাগো ২০১১

৬. মহাত্মা রাইচরণ সরদার ও পৌণ্ড্র সমাজ (সম্পাদিত) ২০১১

৭. ব্রাহ্মণবর্জিত মরণোত্তর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পদ্ধতি ২০১২

৮. সদ্ধম্ম বৌদ্ধধম্ম ঃ ভারতীয় ঐতিহ্য তথা সনাতনধম্ম ২০১২

৯. আমরা কিভাবে ভোট নষ্ট করে চলেছি ২০১৪

১০. তফসিলিদের প্রতি ব্রাহ্মণদের কটূক্তি ২০১৪

১১. সনাতনধর্ম বৌদ্ধধর্ম এবং তফসিলি সংরক্ষণ ২০[illegible]

১২. তফসিলিবর্গের অধিকাংশ শিক্ষিতমানুষের চরি[illegible]

১৩. বৌদ্ধদর্পণ (ব্রাহ্মণ-বর্জিত বিবাহ-গৃহপ্রবে[illegible]-শ্রদ্[illegible] ২০১৭

১৪. ব্রাহ্মণদের সংরক্ষণ ২০১৭, ২০২১

১৫. হিন্দু নামটি বিদেশি পারসিক, গ্রিক ও মুসলমানদের [illegible] ২০১৮

১৬. ব্রাহ্মণ দ্বারা পৌরোহিত্য করালে কি কি অমঙ্গল হয় ২০১৮, ২০২১

১৭. পৌণ্ড্র মহাসঙ্ঘের ইতিহাস ২০১৮

১৮. বাবাসাহেব আম্বেদকর কেন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন ২০১৮

১৯. মানুষের ধর্ম পঞ্চশীল ২০১৯

২০. ভারতীয় সংবিধানের জনক বাবাসাহেব আম্বেদকরের বৌদ্ধধম্মে প্রত্যাবর্তন একটি বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত ২০১৯

২১. মেঘরানী (কাব্য) ২০২১

২২. দাত্রী (কাব্য) ২০২১

২৩. পাষাণ-সুন্দরী (কাব্য) ২০২১

২৪. কাঁটার কুসুম (কাব্য) ২০২১

২৫. হিন্দুধর্মে নারীর স্থান ২০২১